শেখ মুজিব

তাঁকে যেমন দেখেছি

আবুল ফজল

শেখ মুজিব তাঁকে যেমন দেখেছি আবুল ফজল

১৫ আগস্টের ভোররাত্রির নির্মমতা কারবালার নির্মমতাকেও
যেন ছাড়িয়ে গেছে। কারবালায় দু'পক্ষের হাতে অস্ত্র ছিল, তারা ছিল
পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর সে হত্যা কোনো অর্থেই ঠাণ্ডা রক্তে ছিল না।
সৈনিকের পেশা শত্রুনিধন, তার হাতের অস্ত্র উত্তোলিত হয় শত্রুর বিরুদ্ধে
ন্যায়ের পক্ষে। সে যখন হত্যা করে, তখন তা নৈতিক নিয়ম-কানুনের
আওতায় থেকেই তা করে। সৈনিক তো খুনি নয় —তার হাতের অস্ত্র নিরস্ত্র
নিরপরাধের ওপর উদ্যত হয় না। অথচ গত ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের
প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবের বাড়িতে তা-ই ঘটেছে।
এ দিনের অপরাধ আর পাপ সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে আমাদের আতঙ্কটা
বেশি, কারণ বৃহৎ অপরাধ আর বৃহৎ পাপ বিনা দণ্ডে যায় না।
বাংলার মানুষকে সে দণ্ড একদিন একভাবে না একভাবে ভোগ করতেই হবে।
এটিও আমার এক বড় রকমের আতঙ্ক।

আবুল ফজল

ISBN 978-984-8825-24-2

www.baatighar.com

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ আবুল ফজলের জন্ম চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়, ১ জুলাই ১৯০৩। সমাজ ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি, সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁর সাহসী ও খোলামেলা লেখার জন্য তাঁকে 'বাংলার বিবেক' আখ্যা দেওয়া হয়। দীর্ঘকাল শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকা ছাড়াও আবুল ফজল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম জীবনে কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবন ও সমাজের অন্যতম রূপকার যা রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উত্তরজীবনে আবুল ফজল মূলত প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ। রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয়ে তাঁর প্রাগ্রসর ভাবনা তাঁকে দিয়েছিল সর্বজনের শ্রদ্ধার আসন।

গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা-দিনলিপি, ভ্রমন ও জীবনকাহিনি, অনুবাদ ও সম্পাদনা ইত্যাদি মিলিয়ে আবুল ফজল রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশের মতো। বাংলাসাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক, আবদুল হাই সাহিত্য পদক ও স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে সম্মানসূচক ডি.লিট.। ৪ মে ১৯৮৩ আবুল ফজল মৃত্যুবরণ করেন।

স্কেচ : আবুল মনসুর

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি

আবুল ফজল

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০১৬
প্রথম বাতিঘর সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭৮

প্রকাশক : বাতিঘর, প্রেসক্লাব ভবন, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
মুদ্রণ : পূর্বা, ৩৫ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ২৫০ টাকা

Sheikh Mujib : Tānke Jeman Dekhechi (a memories) by Abul Fazal
Published by Baatighar, Press Club Bhaban
Jamal Khan Road, Chittagong, Bangladesh
e-mail: baatighar_bd@yahoo.com Web: www.baatighar.com
Phone: 031 2869391, 01733 067005

Price: Taka 250 only

ISBN: 978-984-8825-24-2

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন নিহত হন তখন বাবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বঙ্গবন্ধুরই আগ্রহে অবসর গ্রহণের পনের বছর পরে প্রায় সত্তর বছর বয়সে তিনি একটি প্রায় অচল হয়ে পড়া ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কাজটাতে অল্পদিনেই তিনি সফলও হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আকস্মিক হত্যাকাণ্ড এবং এর নির্মমতা তাঁকে খুবই বিচলিত করেছিল।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরপরই তিনি ডায়েরিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া লিখেছেন। সেই সময় সব ঘটনা ছিল রহস্যাবৃত, তাঁর মত অরাজনৈতিক নিঃসঙ্গ বয়োবৃদ্ধ মানুষের পক্ষে তা ভেদ করা সম্ভব ছিলনা। অনেক সময় তখনকার বাজারচালু অনেক কথাবার্তা, যার অনেকগুলোই ছিল স্বাধীনতার পরে ঘাপটি মেরে সুযোগের সন্ধানে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের প্রচারণা, তা ধরতে পারেননি তিনি। তবে সামগ্রিকভাবে প্রজ্ঞা ও অন্তর্জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও অবস্থান তুলে ধরতে পেরেছেন। শেষাংশে সংযুক্ত শেখ কামালের স্মৃতিচারণ এই অকালপ্রয়াত তরুণটি সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ একটি লেখা।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বর্তমান সংস্করণে 'দায়মুক্তি ও দায়বদ্ধতা বঙ্গবন্ধু ও আবুল ফজল' শিরোনামে আমার একটি নিবন্ধ সংযোজন করা হলো।

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। বরাবরের বিবেকবান উদার মনের সরল মানুষটি এসময় কিছু বন্ধুজনের অনুরোধে তাঁদের সাথে বিচারপতি সায়েমের

উপদেষ্টামণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ন্যায়নীতি রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এ সরকারের মাধ্যমে অসম্ভব মনে হলে তিনি দেড় বছরের মাথায় উপদেষ্টা পদ ছেড়ে অবসর জীবনে ফিরে আসেন।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড তাঁকে বরাবর ভাবিয়েছে এবং জাতির একজন হিসেবে তিনি বিবেকের দংশনেও ভুগেছেন। তার প্রমাণ মেলে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকালেই তাঁর লেখা আলোচিত 'মৃতের আত্মহত্যা' ও এ সময়ের আরও কয়েকটি গল্পে। কথাসাহিত্যিকের দায় পালনের পাশাপাশি একজন বিবেকবান চিন্তাবিদের দায়ও এড়াতে পারেন নি বাবা। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে অল্প দিন পরেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখেন স্মৃতিকথা–*বঙ্গবন্ধু, তাঁকে যেমন দেখেছি*। এ লেখা ১৯৭৭-এর দিকে সাপ্তাহিক 'মুক্তিবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর ১৯৭৮ সনে প্রথম বই আকারে তারাই প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ আজ যতই এগিয়ে যাচ্ছে, বিশেষত বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়াদের শাসনকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটছে, তাতে বঙ্গবন্ধুর মহত্ত্ব ও অর্জন আরও বড় হয়ে ধরা পড়েছে। ফলে তাঁকে নিয়ে ভাবাবেগের বিস্তার যেমন ঘটছে তেমনি ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা ও অবদান মূল্যায়নের আগ্রহ ও প্রয়োজনও বাড়ছে। সেদিক থেকে আজ বইটির চাহিদা তৈরি হয়েছে নতুনভাবে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ বেছে নিতে বাতিঘরের স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর দাশের জুড়ি নেই। সম্ভবত এ বইটি এসময়ে পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত তার এ গুণটিকেই প্রমাণ করবে।

আবুল মোমেন
চট্টগ্রাম, জানুয়ারি ২০১৬

কৈফিয়ৎ

আমি মনে করি আমার একটা দায়িত্ব আছে। ঠিক শেখ মুজিবের প্রতি নয়, আমার নিজের প্রতিও। আমার বিশ্বাস সব লেখকেরই কোনো না কোনো দায়িত্ব রয়েছে। সব রচনারই উৎস দায়িত্ববোধ, দায়িত্ব-চেতনা। নিজের দেশের প্রতি, নিজের যুগের প্রতি, সেই সঙ্গে নিজের বিবেক আর লেখকসত্তার প্রতিও এ দায়িত্ব বর্তায়। কোনো খাঁটি লেখকই এ দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এ ক্ষুদ্র রচনাটি আমার সে দায়িত্ব পালন। আমার বিবেক আর অনুভূতিকে প্রকাশের এ সুযোগটুকু না দিলে আমি চিরকাল দায়ী হয়ে থাকবো আমার বিবেকের কাছে।

এ রচনা আমার দায়মুক্তির একটি ক্ষুদ্র সনদ।

শেখসাহেবের হত্যার পর পরই এর খসড়া তৈরি হয়েছিল। কোনো কোনো ঘটনা ও সংলাপের জন্য স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাই তারিখ আর আলাপ-আলোচনার ভাষায় কিছুটা ভুলভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। তবে বলতে পারি সজ্ঞানে মিথ্যা দিয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেইনি। আবেগ তো লেখকের চিরসহযাত্রী।

এ রচনার সব বক্তব্যের জন্য আমি দায়ী। এর সঙ্গে আমার বর্তমান কি অতীত পদের কোনো সংযোগ নেই। এ স্রেফ আমার সাহিত্য-কর্মের অঙ্গ।

আমি এ-ও মনে করি আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের শেখ মুজিবের জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এতখানি সুযোগ-সুবিধা পেয়েও তিনি কেন জাতিকে যথাযথ নেতৃত্ব দিতে পারলেন না, তা জানার এবং জেনে তার থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে সবার। চোখ-মন বন্ধ করে থাকলে আগামী দিনের নেতৃত্বকেও ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে। তাই সঠিক রাজনীতির পথ খুঁজে নেওয়ার জন্যও শেখ মুজিবের জীবনকে জানার ও অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

আবুল ফজল

এক

শেখ মুজিব নেই। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাঁকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ওইদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় হত্যাকারীদের এক মুখপাত্র ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করেছে : 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'। যাকে বলে এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সারা দেশ স্তব্ধ ও হতবাক। মন বিশ্বাসই করতে চায় না–বাংলাদেশে, যে বাংলাদেশের স্রষ্টা স্বয়ং শেখ মুজিব, এমন অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। সারা দেশ বোবা, বিস্মিত, হতবুদ্ধি।

শেখ মুজিব না থাকাটা যে বাংলাদেশের জন্য কত বড় শূন্যতা তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি ছিলেন সারা দেশের সামনে ঐক্যের প্রতীক ও ঐক্য রক্ষাকারী এক মহাশক্তি। সে প্রতীক, সে শক্তি আততায়ীর গুলিতে আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। এ নির্মম ঘটনায় যন্ত্রণাবিদ্ধ আমরা সবাই। সে যন্ত্রণা ভাষার অতীত। তাই তার বহিঃপ্রকাশ নেই কোথাও। সবাই ছটফট করছে ভিতরে ভিতরে। বিবেকী মানুষদের বিবেক কাতরাচ্ছে অহরহ।

আমাদের সামনে আজ এমন কোনো মহৎ কবি নেই, যে কবি বাংলাদেশের অন্তরের এ নীরব কান্নাকে ভাষায় কিংবা ছন্দে রূপ দিতে পারেন।

বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সর্বাধিক উচ্চারিত নাম

শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের ইতিহাসের তিনি শুধু নির্মাতা নন, তার প্রধান নায়কও। ঘটনাপ্রবাহ ও নিয়তি তাঁকে বার বার এ নায়কের আসনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বলা যায়, যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে। তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। শত চেষ্টা করেও তাঁর নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না। ইতিহাস দেয় না তেমন কিছু করতে। ইতিহাস নিজের অঙ্গ নিজে করে না ছেদন। শেখ মুজিব ইতিহাসের তেমন এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশের শুধু নয়, বিশ্ব-ইতিহাসেরও। কারণ ইতিহাস অখণ্ড। সুনামে-দুর্নামে, অসাধারণ সাফল্য ও শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

এ অমর মানুষটির সঙ্গে আমার যে সামান্য ব্যক্তিগত পরিচয় আর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার কিছুটা স্মৃতিচারণ আমি এখানে করতে চাই। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের মেয়াদ অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র তিন বছর কয়েক মাস। ২০ মার্চ, ১৯৭৩ এ পরিচয়ের সূত্রপাত আর ১৫ জুলাই, ১৯৭৫ তার সমাপ্তি। এটুকু সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে কারো জীবন কিংবা কর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বা মূল্যায়ন সম্ভব নয়। শেখ মুজিবের রাজনীতি, রাজনৈতিক সাফল্য আর প্রশাসনিক সাফল্যের যোগ্য বিচারক আমি নই। তাই তা থেকে আমি বিরত থাকবো। অধিকন্তু আমি রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মী নই বলে আমার সঙ্গে দেশের কোনো রাজনৈতিক নেতার তেমন কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি কোনোদিন। তেমন সুযোগও আসেনি, এলেও তা আমি পরিহার করে চলেছি সব সময়। সব সময় দূরে থেকেছি রাজনীতি থেকে। কলকাতা কিংবা ঢাকা কখনো আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল না বলে রাজনীতির উত্তাপ আর তার দ্বন্দ্ব-কোলাহল থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে তেমন কিছু কঠিনও হয়নি। এমনকি আমার প্রতি

শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক নেতাদের থেকেও আমি যে যথাসম্ভব দূরে থাকতাম তার এক বড় প্রমাণ স্বাধীনতার আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার একবারও সাক্ষাৎ ঘটেনি। জীবনে জনসভায় তাঁর বক্তৃতা শুনেছি একবার মাত্র। ওই সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল বলে তার অন্যথা হওয়ার জো ছিল না। আর তা-ও স্বাধীনতার পরে।

তাই শেখের ঘটনাবহুল জীবনের যথাযথ পরিচয় আর মূল্যায়ন আমার দ্বারা হওয়ার কথা নয়। অধিকন্তু আমি তাঁর কাছে ঋণী। অবসর জীবন থেকে ডেকে এনে তিনিই আমাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদে নিয়োগ করেছিলেন। এ-ও তাঁর এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত। কারণ ইতিপূর্বে বা পরেও আমার অবস্থার লোক কেউই স্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলর হননি। যাঁরা হয়েছেন প্রায় সবাই আমার চেয়ে উন্নততর পদ আর ডিগ্রির অধিকারী। কাজেই তাঁর সম্পর্কে পুরোপুরি নিরপেক্ষ হতে পারবো তেমন দাবিও আমার নেই। তবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তিনি সম্পূর্ণভাবে বাঙালি চরিত্রের প্রতিভূ ছিলেন। ছিলেন বাঙালির সব রকম সবলতা–দুর্বলতার প্রতীক। একদা মরহুম মুনীর চৌধুরী কথাচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন, 'দেখুন, আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সুযোগ পেলে আমি উপরে উঠতে চাইবো, এ তো খুবই স্বাভাবিক।' তাঁর এ কথাটা কি সত্য? কোনো কোনো ব্যাপারে মুনীর আয়ুব খাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। হয়তো অবস্থার চাপে বাধ্য হয়েই করেছিলেন। এ সম্পর্কে আমার অসন্তোষ অনুমান করেই বোধ করি অযাচিতভাবে ওই স্বীকারোক্তি তিনি করেছিলেন আমার সামনে। আজ আমাদের এ স্বনামধন্য অধ্যাপক-লেখকটিও ঘাতকের অস্ত্রের মুখে হারিয়ে গেছেন।

শেখ মুজিব এবং তাঁর সহকর্মী আর মন্ত্রিসভার সদস্যরা সবাই মধ্যবিত্ত ঘর থেকেই এসেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই

সুযোগ-সুবিধার সহজ শিকারে পরিণত হতে হয়তো বাধেনি। তাঁরা উপরে উঠতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্তের এ স্বভাব-দুর্বলতার জন্যই বোধ করি শেখ মুজিবের দীর্ঘদিনের স্নেহপুষ্ট বিশ্বস্ত অনেক সহকর্মীর পক্ষে তাঁর রক্তাক্ত স্মৃতির উপর দাঁড়িয়ে মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। তাঁরা যখন শপথ নিচ্ছেন তখনো শেখের রক্ত শুকায়নি। অকৃতজ্ঞতা মধ্যবিত্তের আর একটি চারিত্র্য-লক্ষণ। আমি যে আজো ভাইস চ্যান্সেলর রয়েছি তারও পেছনে কি এ গূঢ় কারণটি নিহিত নেই? আমিও ওই শ্রেণি থেকে এসেছি।

আজ সবই রহস্যময় মনে হচ্ছে। মানবস্বভাবটাই বোধ করি এমনি রহস্যময়। এর তল পাওয়া মুশকিল।

দুই

বলেছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। তবে ১৯৬৯-এর শেষের দিকে তাঁর কাছ থেকে আমি তাঁর নিজের হাতে লেখা দু'খানা চিঠি পেয়েছিলাম। তখন তিনি বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সর্বপ্রধান রাজনৈতিক তথা বিরোধী দলের নেতা। চিঠি দু'খানি নিম্নে উদ্ধৃত হলো। দু'খানি চিঠিই তাঁর ব্যক্তিগত মুদ্রিত প্যাডেই লেখা।

শেখ মুজিবুর রহমান

ফোন : ২৪ ২৫ ৬১

৬৭৭ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা

রোড নং ৩২, ঢাকা

তারিখ : ১৭–১১–৬৯ ইং

জনাব অধ্যাপক সাহেব,

আমার ছালাম গ্রহণ করবেন। আশা করি ছহি-ছালামতে আছেন।

সম্প্রতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধ 'শক্ত কেন্দ্র কেন ও কার জন্য' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার সাবলীল লেখনী নিঃসৃত

সৃজনশীল এই প্রবন্ধটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে অধিক সংখ্যক মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারলে নির্যাতিত মানুষের পরম কল্যাণ সাধিত হবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। প্রবন্ধটি আমি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে মনস্থ করেছি। আপনার অনুমতি পেলে কৃতার্থ হব।

আপনার স্নেহের
শেখ মুজিব

অনেকের হয়তো এখনো মনে থাকতে পারে আয়ুব সরকার একদা পাকিস্তানের জন্য Strong centre অর্থাৎ শক্ত কেন্দ্রের প্রয়োজন–এ ধুয়া তুলে এর সপক্ষে জোর প্রচারণা শুরু করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমি 'শক্ত কেন্দ্র কেন এবং কার জন্য'–এ শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধটি দুই কিস্তিতে 'ইত্তেফাকে' ছাপা হয়েছিল। শেখসাহেব সে প্রবন্ধটি পুস্তিকা আকারে ছেপে বিলি করতে চেয়েছেন। উক্ত প্রবন্ধটি আমার 'সমকালীন চিন্তা' নামক বইতে দেখতে পাওয়া যাবে। বলাবাহুল্য তাঁকে অনুমতি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। তারপর তাঁর কাছ থেকে আমি দ্বিতীয় চিঠিটি পাই। সেটিও নিম্নে উদ্ধৃত হলো। এটিও তাঁর মুদ্রিত চিঠির প্যাডে লেখা।

শেখ মুজিবুর রহমান — ফোন : ২৪ ২৫ ৬১

৬৭৭ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
রোড নং ৩২, ঢাকা
তারিখ : ২–১২–৬৯ ইং

জনাব অধ্যাপক সাহেব,

আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করবেন। আপনার চিঠি পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছি। আপনার মত জ্ঞানী, গুণী এবং দেশপ্রেমিকের সাথে দেখা করতে পারলে খুবই আনন্দিত হতাম। আবার যখন চট্টগ্রাম যাব, 'সাহিত্য নিকেতনে' যেয়ে নিশ্চয়ই আপনার সাথে দেখা করব। আপনার লেখা 'রাজধানী' বের হলেই 'শক্ত কেন্দ্রের' সাথে এক করে পুস্তিকাকারে বের করার চেষ্টা করব।

পূর্ব বাংলার অবস্থা আপনি ভালভাবেই জানেন। আমি আমার কর্তব্য করতে চেষ্টা করছি। এ দেশের মানুষ রক্ত দিয়ে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে; তাদের রক্তের সাথে যেন বেঈমানী না করি দোয়া করবেন। আপনার স্নেহ ও ভালবাসা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকুক।

ইতি
আপনার স্নেহের
মুজিব

'কেন্দ্রীয় রাজধানী বনাম পূর্ব পাকিস্তান'—এ নামেও তখন আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটিও তখন ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছিল। এ লেখাটিও আমার 'সমকালীন চিন্তা'য় দেখতে পাওয়া যাবে। শেখসাহেব তাঁর চিঠিতে 'রাজধানী' অর্থে এ লেখাটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

শেখসাহেব '৭০-এর গোড়ার দিকে একবার চাটগাঁ এসেছিলেন। মাস-তারিখ মনে নেই, কোথাও টোকাও নেই। আওয়ামী লীগের জোয়ারে তখন সারা দেশ প্লাবিত। শেখ তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে। সামনে সাধারণ নির্বাচন, তিনি এবার এসেছেন নির্বাচনী প্রচারণায়। জনতার ঢল নেমেছে সারা শহরে,

লোকজন এসেছে গ্রাম ভেঙে। এম এ আজিজ আর তাঁর সহকারী এম এ হান্নান তখনো বেঁচে। দক্ষ ও দুঃসাহসী কর্মী ও সংগঠক হিসেবে এম এ আজিজের তুলনা হয় না।

চট্টগ্রামে রাজনৈতিক জনসভা সাধারণত লালদিঘির ময়দানেই হয়ে থাকে। আগে থেকে রাস্তা-ঘাটে জনতার জোয়ার দেখে লালদিঘির মাঠে স্থান সংকুলান হবে না আশঙ্কা করে এবার সভার আয়োজন করা হয়েছে পলোগ্রাউন্ডে তথা রেলওয়ে মাঠে। ওই দিনই সকালের ফ্লাইটে শেখসাহেব ঢাকা থেকে চাটগাঁ এসে পৌঁছেছেন। রাস্তায় রাস্তায় জনস্রোত, 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে শহর মুখরিত। আমি আমার বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলাম। হঠাৎ ওই সময় দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মী, তার মধ্যে একজন আমার পরিচিত, অত্যন্ত হন্তদন্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটে এসে আমাকে বলল–

: আজিজসাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেখসাহেব প্লেন থেকে নেমেই আজিজসাহেবকে বলেছেন, তিনি এবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, সে ব্যবস্থা যেন করা হয়।

জানতে চাইলাম–

: কোথায় কীভাবে দেখা হতে পারে?

তাঁরা জানালো–

পথে পথে যে রকম জনতার ভিড়, হোটেলে পৌঁছতেই তাঁর হয়তো এগারো-বারোটা হয়ে যেতে পারে। শুনছি তিনি নাকি আবার শেষ ফ্লাইটে চলেও যাবেন। তার চেয়ে আপনি যদি পলোগ্রাউন্ডের সভায় আসেন তাহলে ভালো হয়। আমরা ওখানে প্যাভিলিয়নের ছাদে বসার ব্যবস্থা করেছি। শেখসাহেব ওখান থেকেই ভাষণ দেবেন।

আমি তখন অবসরপ্রাপ্ত। রাজনৈতিক সভায় যাওয়ায় আমার

পক্ষে বাধা থাকার কথা নয়। তবু বললাম–

আমি কোনো রকম রাজনৈতিক সভায় যেতে চাই না! অন্য কিভাবে দেখা হতে পারে তা বরং বলো। জানতে চাইলাম তিনি কোথায় উঠবেন। 'শাহজাহান হোটেল'। তারা জানালো।

চট্টগ্রামের একটি মধ্যবিত্ত হোটেল। সদরঘাট রোডের ধারে। আমি এক-আধবার গিয়েছি ওই হোটেলে। 'ইত্তেফাকের' মানিক মিয়া যখন একবার চাটগাঁ এসেছিলেন, ওই হোটেলেই তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল, তাতেও আমাকে উপস্থিত থেকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। কাজেই ওই হোটেল আমার চেনা।

তারা বলে, যদিও সভার সময় বেলা দু'টা দেওয়া হয়েছে, আমাদের বিশ্বাস, শেখসাহেব খেয়ে-দেয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে সভায় যেতে অন্তত তিনটা হয়ে যাবে। সভাশেষে তিনি হয়তো সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবেন। তিনি সভায় রওয়ানা হবার আগে যদি আপনি হোটেলে আসতে পারেন তাহলে দেখা হতে পারে। তথাস্তু। আমি তাতেই রাজি হলাম। বললাম–

: আমি দুটো-আড়াইটার মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

তারা বিদায় নিলো।

আমি খেয়ে-দেয়ে বেবিটেক্সি নিয়ে বেলা দুটোর সময় আমার বাসা থেকে রওয়ানা হলাম। জনতার ব্যূহ ভেদ করে হোটেল শাহজাহানে পৌঁছতে আড়াইটার কিছু বেশি হয়ে গেলো।

খুঁজে পেতে তাঁর রুমে গিয়ে দেখি রুম খাঁ খাঁ করছে। বিছানাপত্র, টেবিল-চেয়ার সব ছত্রখান। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এন্তার সিগারেটের গোড়ালি। পাশের রুমে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি এম এ হান্নান কয়েকজন কর্মীর সাথে বসে আলাপরত। আমি জিজ্ঞাসা করতেই বললেন–

শেখসাহেব সভায় চলে গেছেন। খবর এসেছে সভা লোকে টইটম্বুর। জনতা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। গোলমাল হচ্ছে। শুনেই শেখসাহেব কালবিলম্ব না করে রওয়ানা হয়ে গেছেন সভার উদ্দেশ্যে।

আমি কিছুটা নিরাশ হয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

তখন সান্ধ্যভ্রমণ আমার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। ওইদিনও যথারীতি মাগরেবের পর আমি বেরিয়ে গেছি সান্ধ্যভ্রমণে। ফিরে এসে স্ত্রীর মুখে শুনলাম শেখসাহেব এসেছিলেন দেখা করতে। রাস্তার পাশে বাড়ি। গাড়ি থেকে খবর নিয়েছেন আমি আছি কিনা। নেই শুনে ফিরে গেছেন। হয়তো আমার মতো তিনিও কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন সেদিন।

সভা থেকে হোটেলে ফিরে এসে যখন শুনলেন আমি দেখা করতে এসেছিলাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই আবার গাড়িতে গিয়ে উঠে যেসব কর্মী আমার বাসা চেনে তাদের দু'একজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

কাজেই এবারও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা কিংবা পরিচয় হলো না।

সে পরিচয় হয়েছে স্বাধীনতার পর, তিনি যখন পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তখন।

তিন

আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমরা বাংলাদেশের বাইরের কারো কাছে যদি এককভাবে ঋণী হয়ে থাকি, তা হলে তিনি হচ্ছেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এ দুঃসাহসী ও দূরদর্শিনী মহিলার সার্বিক সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপ না হলে আমাদের স্বাধীনতা যে শুধু বিলম্বিত হতো তা নয়, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্গতিরও সীমা থাকতো না। মাত্র ন'মাসে যে আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি তার প্রধান কারণ ভারতের সহায়তা ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ। সে হস্তক্ষেপ মানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী–এ যুগের বিশ্ব–ইতিহাসের এক অসামান্যা নারী।

শেখসাহেবের আমন্ত্রণে সে ইন্দিরা গান্ধী এলেন বাংলাদেশ সফরে। এলেন ১৯৭২, ১৭ মার্চ। ফিরে গেলেন ২০ মার্চ সকালে।

১৯ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে বঙ্গভবনে এক রাষ্ট্রীয় ভোজ তথা ব্যাংকোয়েটের ব্যবস্থা করেছেন। বিরাট ভোজসভা, ঢাকার গণ্যমান্য সবাই আমন্ত্রিত।

এর দু'দিন আগে হঠাৎ চট্টগ্রামের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক মি. এম এ সামাদ আমাকে ডেকে বললেনঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যাংকোয়েটে আপনি আমন্ত্রিত। তাঁর ইচ্ছা আপনি যেন তাঁর ভোজসভায় শরিক হন।

উত্তরে আমি তাঁকে জানালাম–

আমার পক্ষে ট্রেনে কিংবা বাসে যাওয়া সম্ভব নয়। গেলে বিমানেই যেতে হয়। কিন্তু এক বেলা খাওয়ার জন্য আমি একশ' কুড়ি টাকা (তখন বিমানে এক দিকের ভাড়া ছিল ষাট টাকা) খরচ করতে রাজি না।

তিনি তবুও নাছোড়বান্দা। বললেন–

দেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে না যাওয়াটা বড্ড খারাপ দেখাবে।

আরো অনেক কথা বলার পরও যখন আমি রাজি হচ্ছি না দেখে অগত্যা তিনি বললেন–

আপনার যাতায়াতের ব্যবস্থা আমরাই না হয় করে দেবো। তবুও আপনি যান।

এ অবস্থায় রাজি না হওয়ার কোনো মানে হয় না।

ডি.সি. যথাসময়ে বিমান টিকিট পাঠিয়ে দিলেন আমার বাসায়। সাবেক লাটপ্রাসাদ, স্বাধীনতার পর যার নাম হয়েছে বঙ্গভবন, তার বিরাট হলঘর অভ্যাগত আমন্ত্রিতে টইটম্বুর। অতিথি ও অন্যান্য লোকজনে গিজগিজ করছে সারা হল।

আমরা ক'জন আসন নিলাম পেছনের দিকে একটা টেবিল ঘিরে। আমাদের টেবিলে ছিলেন কবি জসীম উদ্‌দীন ও তাঁর স্ত্রী, শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কবি সুফিয়া কামাল ও তাঁর স্বামী কামাল উদ্দীন খান–এমন সমমনা আরো দু'একজন।

ভোজের পর জসীমউদ্‌দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ'-এর নাট্যমঞ্চায়নও দেখা গেল। এটির ব্যবস্থা হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানে। এমন জনাকীর্ণ পরিবেশে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা কিংবা পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁর এ

ভোজসভায়ও তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না আমার। হলো না কোনো রকম আলাপ-পরিচয়।

পরদিন ২০ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী সফর শেষে ফিরে গেলেন সকাল ১০টায়।

নীলক্ষেতে ৩১/ই বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক গৃহে আমার মেয়ে-জামাই থাকে। ঢাকায় এলে আমি ওখানেই উঠি। হঠাৎ ওইদিন দুপুরে এম আর আখতার (মুকুল), তথ্য বিভাগের তদানীন্তন যুগ্ম সচিব বাহাউদ্দীন আহমদ, সঙ্গে সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরীও রয়েছেন, ওই বাসায় এসে হাজির। জানালেন–

: শেখসাহেব পাঠিয়েছেন।

: কী ব্যাপার! কেন?

: কী করে যেন শেখসাহেবের কানে গেছে আপনি এসেছেন।

আপনার সঙ্গে তিনি আলাপ করতে চান। আমরা পাঁচটার সময় গাড়ি নিয়ে আসবো। তিনি বলে দিয়েছেন আপনাকে যেন নিয়ে যাই। আপনি তৈয়ার থাকবেন। এ বার্তা দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

পাঁচটার কিছু আগে তাঁরা গাড়ি নিয়ে ফের এলেন। আমার দ্বিতীয় ছেলে আবুল মঞ্জুরও আমাদের সঙ্গী হলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কোলকাতায় থাকতে কে বা কারা তাকে নাকি বলেছিলেন–

আপনারা যখন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গানটিকে আপনাদের জাতীয় সংগীত করে নিয়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত সঠিক সুরেই তা গাওয়া উচিত। এখন যে সুর গাওয়া হচ্ছে তা ভুল। কবির ভাইঝি ইন্দিরা চৌধুরানী যে সুর দিয়েছেন সেটিই সঠিক এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত। কাজেই ওই সুরেই

গাওয়ার কথা শেখসাহেবকে বলবেন।

বিজয়ের পর কোলকাতা ছেড়ে আসার সময় ওরা তার হাতে কিছু স্বরলিপির বই ও সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিন ইত্যাদিও দিয়েছিল। এবং অনুরোধ জানিয়েছিল এগুলো যেন শেখসাহেবের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়। এ সুযোগে ওইগুলো শেখসাহেবের হাতে দেয়ার জন্য সে-ও আমাদের সঙ্গে এলো।

তখন শেখসাহেব বসতেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হাউজে। নতুন গণভবনের সাজসজ্জা আর মেরামত ইত্যাদির কাজ তখনো শেষ হতে বাকি। আমরা যখন পৌঁছলাম তখনও তিনি এসে পৌঁছাননি নিজের বাসা থেকে। একান্ত সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরীর কক্ষে গিয়ে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেখসাহেব এসে গেলেন। দক্ষিণের দীর্ঘ বারান্দায় দু'সারি হয়ে দর্শনার্থীরা বসে আছেন বহু আগে থেকেই। আমি এসেছি খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। আমি বারান্দার মাঝপথে থাকতেই তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তিনি নিজেও বসলেন পাশে। হুকুম করলেন চায়ের। মুহূর্তে এক অসাধারণ উষ্ণ হৃদয়ের যেন পরশ পেলাম।

প্রথাগত কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর উপরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—

উপরে এসে থাকুন না আপনি। বসে বসে লিখবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আপনাকে আলাদা রুমও দিয়ে দেবো।

শুনে আমি হাসলাম। ভিতরে ভিতরে মুগ্ধও হলাম তাঁর আন্তরিকতায়—গুণগ্রাহিতায়।

আমার ছেলে মঞ্জু কলকাতা থেকে আনা স্বরলিপির

পত্র-পত্রিকাগুলো তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললো–

: ওরা এ সবের প্রাপ্তি স্বীকার আশা করে।

সহকারী সচিব বা কে একজনকে ডেকে এগুলো তাঁর হাতে দিয়ে বলে দিলেন একটা প্রাপ্তিস্বীকার যেন পাঠিয়ে দেয়া হয় ওদের ঠিকানায়। তারপর শুদ্ধ আর অশুদ্ধ স্বরলিপি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন–

দেখুন, যে সুরে এ গান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়ে গেছে, যার সঙ্গে জনগণের পরিচয় অনেক দিন ধরে, একেবারে বিশুদ্ধ না হলেও, তা এখন পরিবর্তন করতে গেলে যথেষ্ট জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যে এ সুর যন্ত্রায়িতও হয়েছে। সামরিক বাহিনীর ব্যান্ডে তা বাজানো হয়। এখন রদবদল করতে গেলে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। নতুন করে শেখানো সে-ও তো কম ঝামেলার কথা নয়।

চা এলো, সঙ্গে ছোট ছোট সিঙ্গাড়া আর পুদিনার সস্।

মঞ্জু'র কাছে জানতে চাইলেন–

: তুমি এখন কী কর?

সে উত্তরে বললো–

: কিছু না।

তখন তিনি বললেন–

: কী করতে চাও বলো। আমি বলে দিই।

মঞ্জু বললো–

: আমি চাকুরি করবো না।

: তবে কী করবে?

: ব্যবসা করবো।

তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাসি হেসে বললেন—

ব্যবসা-টেবসা হবে-টবে না। আমরা সব জাতীয়করণ করে নেবো।

অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলাপ হলো। ফিরে এলাম এক অসাধারণ মানবিক উষ্ণতার স্পর্শ নিয়ে। এ উষ্ণতা অত্যন্ত আন্তরিক ও অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

আমাদের দেশের এ যুগের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এভাবেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ও প্রথম আলাপ।

শালপ্রাংশু দেহ শেখ মুজিবের মুখের দিকে চেয়ে থাকা যায় অনেকক্ষণ ধরে। ওই মুখে কোনো রুক্ষতা কি কর্কশতার চিহ্ন ছিল না। তাঁর হাসি ছিল অপূর্ব, অননুকরণীয়। এমন হাসি অন্য কারও মুখে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কে একজনকে আদেশ করলেন—

এঁর জন্য গাড়ি আছে তো? এঁকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করো।

চার

তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার চট্টগ্রামে।

মাস-তারিখ মনে নেই। ১৯৭২-এর শেষের দিকে অথবা তিয়াত্তরের প্রথমার্ধেই হবে। স্বাধীনতার পর এই সর্বপ্রথম তাঁর চট্টগ্রামে আগমন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম শুভাগমন। স্বভাবতই সরকারি ও বেসরকারি মহলে ব্যস্ততা আর সমারোহের অন্ত নেই। সারা দেশ ভেঙে জনতা ভিড় জমিয়েছে শহরে।

সরকারি আর বেসরকারি লোক নিয়ে গঠিত হয়েছে অভ্যর্থনা কমিটি। আমার অনুপস্থিতিতে আমাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। স্থির হয়েছে হেলিকপ্টার যোগে তিনি অবতরণ করবেন সার্কিট হাউসের সামনের খোলা জায়গায়। সেখানে তাঁকে মাল্যভূষিত করে জানানো হবে প্রাথমিক অভ্যর্থনা। বিকেলে জনসভা পলোগ্রাউন্ড বা রেলওয়ে ময়দানে। অসম্ভব ভিড়। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের একটি অগ্রভূমিকা রয়েছে। যাঁর নাম মুখে নিয়ে তারা সংগ্রাম করেছে তাঁকে অভ্যর্থনার ব্যাপারে স্বভাবতই তারা পেছনে পড়ে থাকতে নারাজ। অন্য দর্শনপ্রার্থীরাও অধীর। হেলিকপ্টার মাটি স্পর্শ করতে না করতেই পুলিশ কর্ডন তছ্‌নছ, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল কার আগে কে তাঁকে মাল্যভূষিত করবে। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে জহুর আহমদ

চৌধুরীরও অগ্রাধিকার রয়েছে। এ হট্টগোলের মধ্যে আমিও কোনোরকমে মালা একটি পরিয়ে দিলাম তাঁর গলায়। তারপর তিনি আমার হাত ধরে উপরে উঠে এলেন–হাঁটতে হাঁটতে বিশৃংখল জনতাকে কিছুটা ভর্ৎসনাও করলেন। আমাকে বললেন–

আপনার দুর্দশা দেখেই আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। প্রোটোকলের অপেক্ষা করলাম না।

উঠে এসে সার্কিট হাউসের দোতলার বারান্দায় বসে পড়ে তিনি যেমন আমরাও তেমনি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলাম। জনাব এ.কে. খানও ওখানে প্রতীক্ষায় ছিলেন। হেলিকপ্টারের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ধরে রোদে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফলে খুবই ক্লান্তবোধ করছিলাম। এখনকার মতো বিদায় নিলাম তাঁকে বলে। বললাম–

: বিকেলে সভায় ফের দেখা হবে।

তিনি বললেন–

: এখান দিয়ে আসুন না। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বললাম–

: না। আমার কিছু আগে যেতে হবে। আমি সোজা সভায় চলে যাবো, আপনার তো অনেক সাঙ্গপাঙ্গ, তারা আপনার সঙ্গ নেবে।

তিনটার মধ্যেই আমি সভায় গিয়ে হাজির হলাম। রেলওয়ে ময়দানের প্যাভেলিয়নের ছাদের উপর আমাদের আসন পাতা হয়েছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে এসে বসেছেন সারিবদ্ধ চেয়ারে। সামনে বিরাট মাঠে তিল ধারণের স্থান নেই। হঠাৎ কয়েকজন উত্তেজিত ছাত্র মঞ্চে উঠে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো–

যারা দালাল তাদের স্থান হবে না এ মঞ্চে, তারা নেমে যাক মঞ্চ থেকে।

ইত্যাদি আরো কী কী সব কঠোর কথা বলছিল ওরা। সবাই

অসম্ভব উত্তেজিত, প্রায় মারমুখো। সব এখন আর মনে নেই। যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের অনেকে চেয়ার ছেড়ে সুরসুর করে নেমে গেলেন। এঁদের মধ্যে দু'একজন স্থানীয় এমপি-ও ছিলেন। নিমন্ত্রিত হয়ে এভাবে অপমানিত হওয়ার কোনো মানে হয় না। তাই তাঁরা সসম্মানে সরে পড়লেন। আমি মনে মনে দুঃখিত হলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যে জহুর আহমদ চৌধুরী আর কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে শেখসাহেব এসে পড়লেন। জনতা জয়ধ্বনি ও নানা শ্লোগানে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে তুলল। তিনি চারদিকে ঘুরে ঘুরে দু'হাত তুলে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করলেন আসন নেয়ার আগে। তিনি আসন নিতেই জাতীয় সংগীত শুরু হলো। উঠে দাঁড়ালাম সবাই। সংগীত শেষে অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব হান্নান। তারপর জহুর আহমদ চৌধুরী আর সভাপতি হিসেবে আমি স্বাগত সম্ভাষণ জানালাম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি আমাকে বললেন–

বক্তৃতায় গত মুক্তিযুদ্ধে এবং অন্যভাবে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য দোয়া করবো, তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করবো, আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

বললাম–

: আমি কেন কিছু মনে করতে যাবো? দোয়া করবেনই তো?

স্বাধীনতার সূচনায় ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ সেকুলারিজম কথাটা একটু বেশি মাত্রায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল! কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার ফলেই বোধকরি তিনি ওই রকম একটা কথা বললেন আমাকে। উঠে দাঁড়িয়েই তিনি সর্বাগ্রে সব শহীদের জন্য খোদার রাহে মাগফেরাত কামনা ও মুনাজাত করে তবে বক্তৃতা শুরু করলেন।

পাঁচ

তারপর তিয়াত্তরের এপ্রিল। সাক্ষাতে নয়, টেলিফোনে আলাপ। এ-কথা অন্যত্র ও সূচনায় বলেছি। আবার পুনরাবৃত্তি করছি এখানে। কারণ, এ-ও শেখ মুজিবেরই কথা। ১৯৭৩-এর ৫ এপ্রিলের ডায়রিতে যা লিখে রেখেছিলাম অবিকল তাই উদ্ধৃত করছি।

৫-৪-৭৩

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বৈঠকখানায় বসে দৈনিকের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। তখন বাইরের দিকের দরজায় হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি একজন অপরিচিত লোক। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো–

আমি বিমান অফিস থেকে আসছি। শিগগির আসুন, বঙ্গবন্ধু আপনার সঙ্গে ফোনে আলাপ করবেন, তিনি ফোন ধরে আছেন।

লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে ছুটে গেলাম বাংলাদেশ বিমান অফিসে। আমার বাসা থেকে বেশি দূরে নয়। বড়জোর তিন মিনিটের পথ। বলাবাহুল্য আমার বাড়িতে তখন কোনো ফোন ছিল না। ফোনে সংযোগ হতেই শেখসাহেব সর্বাগ্রে জানতে চাইলেন, আমার শরীর কেমন আছে।

বললাম–

এ বয়সে যেমন থাকার সে রকমই আছে। খুব ভালোও না, আবার তেমন মন্দও না। বয়সানুসারে মোটামুটি ভালো আছি বলতে পারি।

শেখসাহেব বললেন–

চট্টগ্রামে আপনাকে আমি একটা দায়িত্ব দিতে চাই, আপনি তা নিতে রাজি তো?

বললাম–

: যেসব ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা আছে, যেমন শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি–এসব ক্ষেত্রে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলে আমি তা যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করবো।

আরও কিছু ঘরোয়া আলাপের পর ফোন রেখে দেয়ার সময় তিনি বললেন–

: আমি আপনাকে আগামীকাল খবর দেবো।

আগামীকাল দেশের প্রধানমন্ত্রী কী খবর দেবেন? মনে বেশ কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে আগামী দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম। বাসায় কাউকে কিছু জানালাম না।

পরদিন ভোরে নিয়মমাফিক অভ্যস্ত প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি। পথে সহপ্রাতঃভ্রমণকারীদের সাথে দেখা হতেই তাঁরা সবাই প্রায় সমস্বরে আমাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করলেন।

কী ব্যাপার! আমি তো অবাক!

তাঁরা জানালেন, গত সন্ধ্যায় ঢাকা বেতারের আটটার নিউজে ঘোষণা করা হয়েছে, আপনাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে।

সবার মুখে একই প্রশ্ন–

আপনি শোনেননি? আপনাকে আগে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি?

শেখসাহেবের সঙ্গে গতকাল ফোনে আমার যে আলাপ হয়েছে, এবার তাঁদের সে খবরটা জানালাম।

তখন আমার বাসায় রেডিও বা ট্র্যানজিস্টরও ছিল না। তাই গতরাতের রেডিওর খবর বাড়িতে আমরা কেউ শুনিনি।

সরকারি আদেশপত্র পেলাম ১৮ এপ্রিল।

১৯ এপ্রিল, ১৯৭৩-এ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম।

৭-৫-৭৩

আজ সন্ধ্যা ৬টায় গণভবনে শেখসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা। আগেরদিন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডক্টর নূরুল ইসলাম আর অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গেও আমি দেখা করেছি। উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা। শেখসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যও তাই।

দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে আলাপ। মনে হলো তিনি আজ বেশ খোশমেজাজে আছেন। ঘরোয়া রসিকতা থেকে রাজনীতি–কিছুই বাদ গেল না। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রাসেলকেও দেখলাম ওখানে একা একা ঘুরঘুর করছে। বাপের সঙ্গে এসেছে গণভবনে, শিশুসুলভ উৎসাহ, কৌতূহল নিয়ে এ কক্ষ থেকে ও কক্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাংলা শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা বলেই বোধকরি দেখাচ্ছিল রোগা রোগা।

বললাম–

: বাপের স্বাস্থ্য পায়নি।

আমার এ মন্তব্যের পর উপস্থিত ওখানকার বয়স্ক এক সেবক বললো–

চৌদ্দ-পনের হতে হতেই, দেখতে দেখতে ইয়া লম্বা হয়ে যাবে স্যার। ও হয়তো পুরনো লোক, দেখেছে শেখসাহেবের ছেলেরা প্রথমে রোগা-পটকা থাকলেও কৈশোরে পা দিতে না দিতেই লক্ লক্ করে বেড়ে ওঠে।

স্বয়ং শেখসাহেবও নাকি প্রথমে তাই ছিলেন। চায়ের হুকুম হলো। চা এলো। চা খেতে খেতেই আলাপ চললো।

বললেন–

গত পনেরো মাস ধরে তিনি কোনো মাইনে নিচ্ছেন না। কেউই এখন জানে না। প্রচার করেন নি কথাটি। স্ত্রীর কিছু আয় আছে, তাতেই সংসার চলে। নাস্তা করে সকাল ন'টায় গণভবনে আসেন আর রাত দশটা-এগারোটায় ফেরেন। দুপুরে খাবার পাঠিয়ে দেন বেগমসাহেবা বাড়ি থেকে।

ছয়

স্বাধীনতার পর আমাদের তরুণ সমাজের একাংশের অত্যন্ত মতিভ্রম ঘটেছে। এদিকে শিক্ষার মান দ্রুত নেমে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃংখলা রক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক দুরূহ ব্যাপার। ছাত্ররা চলে গেছে শাসন-শৃংখলার বাইরে। পরীক্ষা, পরীক্ষার ফলাফল স্রেফ প্রহসনে পরিণত। চুরি, ডাকাতি, ব্যাংকলুট, রাহাজানি, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে বা নেয়নি এমন বহু তরুণও এসব কাজে লিপ্ত। চারদিকে শুধু নিন্দাই শুনতে পাচ্ছি আমাদের তরুণদের সম্বন্ধে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এখন দেশের মানুষের ওপর। শিক্ষিত আর দক্ষ লোক ছাড়া দেশের শাসনকার্য চালাবো কী করে আমরা? স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা সফল করে তোলা আরো কঠিন। শিক্ষাঙ্গনে যেভাবে নৈরাজ্য বেড়ে গেছে তাতে কোনোরকম সুশিক্ষাই চলতে পারে না। যাঁরা দূরদর্শী আর সেইসঙ্গে আর্থিক সঙ্গতিও যাঁদের রয়েছে তাঁরা অনেকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বাইরে, বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ দিয়েছেনও । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছি বলে দেশের শিক্ষাঙ্গনের দুর্দশার চিত্র আমার মনে সবসময় আনাগোনা করছিল। শেখসাহেবের নিজের ছেলেদের নিন্দার কথাও আমাদের কানে আসতো। সঙ্গত কি অসঙ্গত জানি না, তবে স্বভাবতই দুঃখ বোধ

করতাম।

তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও বললাম–

ছেলেদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে ভালো শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন না কেন? এখানে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে ভালো লেখাপড়া না হওয়ারই কথা।

উত্তরে তিনি বললেন–

দেখুন, আমার ছেলেদের যদি আমি বিদেশে পাঠাই অন্যেরা কী করবে? দেশের সবার ছেলেমেয়েকে তো আর আমি বিদেশে পাঠাতে পারবো না।

কথাটা সত্য। এ সেন্টিমেন্ট প্রশংসারও যোগ্য।

তবুও আমি বললাম–

নেহেরুরা কিন্তু ওঁদের মেয়েদের পর্যন্ত বিদেশ পাঠিয়ে সুশিক্ষা দিতে কখনো দ্বিধা করেননি। এমনকি বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সমুদ্রপথ নিরাপদ ছিল না, তখনো ওঁরা লেখাপড়ার জন্য মেয়েদের বিদেশ পাঠিয়েছেন। ওঁদের সম্বন্ধে যেসব বই লেখা হয়েছে তাতে আমি এসব কথা পড়েছি।

তাঁর এক ছেলে নাকি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে চায়, সে কথা বলে যোগ করলেন–

: দেখি ওকে স্যান্ডহার্স্টে পাঠাতে পারি কিনা।

শুনে খুশি হলাম। ছেলেটা অন্তত একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আসবে। সুকঠিন ডিসিপ্লিনের জন্য বিলাতের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্যান্ডহার্স্ট বিশ্ববিখ্যাত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ছাড়া আরো কিছু কথা, যার সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সুনাম-দুর্নাম জড়িত, তা বলার সংকল্প নিয়ে এবারকার সাক্ষাৎকার চেয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। অনেক সময়

স্বার্থান্বেষী অবুঝ আত্মীয়স্বজনেরা অসাধারণ প্রতিভাধর নেতৃত্বের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে নেতারা যে নিন্দাভাজন হন তার মূলে এ ধরনের আত্মীয়স্বজনদের কার্যকলাপ কম দায়ী নয়। আমাদের কালে এ. কে. ফজলুল হক আর খাজা নাজিমউদ্দীন—দুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যাঁদের সুনাম আত্মীয়দের দ্বারা নানাভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

বললাম—

আপনারও অজানা থাকার কথা নয়, শেরে বাংলার মতো অসাধারণ জনপ্রিয় নেতাকেও তাঁর আত্মীয়রাই ডুবিয়েছেন। যে সুনাম তাঁর প্রাপ্য ছিল শেষ পর্যন্ত তা তিনি রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর ভাগিনারাই যদি তাঁকে...

বাক্য শেষ না করে অপর দৃষ্টান্তটিও উল্লেখ করলাম—

খাজা নাজিমউদ্দিন অত্যন্ত পরহেজগার ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন শুনেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও সুনাম বজায় রাখতে পারেন নি। ভাই-বেরাদারদের জন্য তাঁকেও বহু দুর্নামের ভাগী হতে হয়েছে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে শেখসাহেব বলে উঠলেন—

আমার একটা ভাগিনাই তো শুধু কিছুটা কাজকর্ম করছে। আমি তাকে বলে দিয়েছি, একজনের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। তুমি সাংবাদিকতাও করবে, একসাথে আবার আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগও করবে—এ হয় না। দেখ না আমি সারাজীবন একটা ধরে ছিলাম বলে আজ এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। তাকে আমি বারণ করে দিয়েছি।

লাল বাহিনীর দৌরাত্ম্যের কথাও তুললাম। বললাম—

: এতে আপনারই বদনাম হচ্ছে। লোকে বলছে আপনিই নাকি

প্রশ্রয় দিচ্ছেন এদের।

বললেন–

আমি তো ইতোমধ্যে নিষেধ করে দিয়েছি। এদের কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে বলেছি।

বললাম–

আমি আজও ওদের লাঠি হাতে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে দেখতে পেলাম। আর ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন ঝট্‌পট দোকানপাট বন্ধ করে পালাচ্ছে। এ দৃশ্যও দেখে এলাম পথে।

তিনি স্থানটা, অর্থাৎ location জানতে চাইলেন।

ঢাকায় অলিগলি আমার চেনা নয়। তাই স্থান নির্দেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো আমার ঢাকায় আসা। সহযাত্রী হয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই মিলে আমাকে হোটেল পূর্বাণীতে তুলেছিলেন। সেখান থেকে আসার পথে ওই দৃশ্য আমি দেখেছি। হোটেলের বন্ধ কক্ষ, নিঃসঙ্গতা আমার মোটেই পছন্দ নয়। এরপর আমি আর কখনো হোটেলে উঠিনি। যদিও সাঙ্গপাঙ্গরা বার বার বলছিলেন আপনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ওঠারও হকদার। আমি কিন্তু এর পর থেকে সবসময় মেয়ে-জামাই'র বাসায় উঠেছি। আর কোনোদিন হোটেলমুখো হইনি।

স্থান বা রাস্তার নাম আমি বলতে পারলাম না। তবে পূর্বাণী হোটেলের কাছাকাছি লাল বাহিনীর লাঠিয়ালদের দোকানে দোকানে ঢুঁ মারা আমি নিজের চোখে দেখেছি তাঁকে সে কথা জানালাম।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের কথা তুললাম। অনুরোধ জানালাম কিছু অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা হাতে

তুলে নিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডক্টর নূরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ হতেই বললেন–

আমার সামনে এক গুরুজন বসে আছেন। আবুল ফজল সাহেব বলছেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু টাকা না দিলে চলে না। দেখুন না কিছু টাকার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

নূরুল ইসলাম কী বললেন তা আমি শুনতে পাই নি। পরে দেখেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছিল ওই বার। গণভবনের ভিতরে-বাইরে অনেক দর্শনার্থী অপেক্ষমান। আমি রীতিমত বিব্রত বোধ করছিলাম।

বললাম–

: আমি উঠি। ওঁরা বসে আমাকে হয়তো বদ্‌দোয়া দিচ্ছেন।

বসেন, বসেন, আজ আর কাউকে ইন্টারভিউ দেব না। তাঁর স্বাভাবিক উচ্চহাসির সঙ্গে বলে উঠলেন।

লিয়াজোঁ অফিসারেরা বার বার দরজা ফাঁক করে উঁকি মারতে লাগলো। তবুও তিনি ছাড়েন না আমাকে। উঠতে গেলেই বাধা দেন। মনের অনেক পুঞ্জীভূত খেদকেই যেন মুক্তি দিতে চাচ্ছেন। দুঃখের সাথে বললেন–

কী করি, কোথাও তো ভালো লোক পাচ্ছি না। যাকে যেখানেই বসাই সে-ই চুরি করে। অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত ছেলেদের বেছে বেছে নানা কল-কারখানায় প্রশাসক বানালাম, দু'দিন যেতে না যেতে তারাও চুরি করতে শুরু করলো। যাকে পাই বলি, আমি কিছু সৎ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সাধারণ ক্ষমার কথা আমি কাগজে একাধিকবার লিখেছি।

এবার সুযোগ পেয়ে সামনাসামনি কথাটা তাঁকেও আবার বললাম।

উত্তরে তিনি জানালেন, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে তাঁরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিন-চার দিনের মধ্যেই তা ঘোষণা করা হবে। তাতে প্রথম কিস্তিতে হাজার দশেক লোক উপকৃত হবে। ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে আমরা এ পথে অগ্রসর হবো। যারা সুনির্দিষ্ট অপরাধ করেছে শুধু তাদেরই শাস্তি হবে, বাদবাকি সবাইকে আমরা ছেড়ে দেবো।

উৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম–

: আমরাও তো তাই চাই।

লিয়াজোঁ অফিসারের উঁকি মারা আর দরজায় মুখ বাড়িয়ে থাকার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো। আমার অস্বস্তি দেখে শেখসাহেব এবার পাইপটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি দরজার বাইরে পা বাড়াতেই জিজ্ঞাসা করলেন–

: গাড়ি আছে?

বললাম–

: আছে।

লিয়াজোঁ অফিসারকে বললেন–

: ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো।

ছ'টায় ঢুকেছিলাম গণভবনে, সাতটার পরে বেরিয়ে এলাম।

সাত

১১-১১-৭৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো নয়। স্বাধীনতার পর নানা কারণে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ ধসে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো উপার্জনী সংস্থা নয় বলে আর্থিক সংকটের তীব্রতা ওখানেই বেশি অনুভূত হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই এ দশা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটের প্রতিকারের আশায় শেখসাহেবের সঙ্গে আজ আবার সাক্ষাৎ করলাম। সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল সকাল সাড়ে দশটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা শেষে দেশের নানা ব্যাপারেও দীর্ঘ আলোচনা হলো তাঁর সঙ্গে। আত্মীয়দের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণতি কখনো শুভ হয় না। বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেকে যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করে না। ক্ষমতাসীনদের আত্মীয় শুনলেই অকারণেও উদ্দেশ্য আরোপ করে থাকে। ফলে সত্য-মিথ্যা নানা নিন্দার সম্মুখীন হতে হয় ক্ষমতাসীনকে। শেখসাহেবকেও হতে হয়েছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত ছিলাম। সারা দেশের তিনিই একমাত্র নেতা, জাতির একমাত্র আশা-ভরসা। তাঁর মানসচিত্র (ইমেজ) দিন দিনই অত্যন্ত অবনমিত হচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলাম। শেখ তো সাধারণ একজন নেতা নন, ছলে-বলে-কৌশলে কিংবা সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্ষমতাসীন

হননি। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েছেন বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক পথে। কাজেই এমন নেতার সুনাম নষ্ট হতে দেখলে কার না মনে দুঃখ হয়?

স্বজনপ্রীতি যে অনেকের ধ্বংসের কারণ হয়েছে আমি আবারও আজ সে কথা উত্থাপন করলাম। আলোচনায় ফজলুল হক-নাজিমউদ্দীনের কথা স্বভাবতই পুনরুত্থাপিত হলো। এ দু'জন নেতার দৃষ্টান্ত সবসময় আমার মনে জাগরূক ছিল। তবে এসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে ইশারা করার বেশি আমার তো করণীয় ছিল না কিছু। আমি দলের বা সরকারের লোক ছিলাম না। কাজেই ভিতর থেকে চাপ সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ ছিল না আমার।

১১-১২-৭৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরো কয়েকজন দেশবিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীর সাথে এবার আমাকেও সাহিত্যের অনারারি ডক্টরেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দু'দিন আগে ৯ ডিসেম্বর এক বিশেষ সমাবর্তনে ওই ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। প্রধানত সে উপলক্ষেই আমার এবার ঢাকা আগমন। ন' তারিখ অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে সমাবর্তন পর্ব শেষ হলো। দশ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মিটিং–চ্যান্সেলরের নমিনি হিসেবে আমিও উক্ত সিনেটের সদস্য। ঢাকায় যখন এবার কয়েকদিন থাকতে হবে তখন মনে করলাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও একবার দেখা করে আসা যায়। চাটগাঁ থেকেই ফোনে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এগারো তারিখ সকাল সাড়ে দশটায় তিনি সাক্ষাৎকারের সময় দিয়েছেন।

আমি আজ সাড়ে দশটায় শেখসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এ খবর বন্ধুদের কেউ কেউ আগে থাকতেই জানতেন। এবারও আমি মেয়ে-জামাই'র বাসায় (৩১/ই বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা) উঠেছি। ওই দিন সকালে ওই বাসায় দেখা

করতে এলেন সরদার ফজলুল করিম। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'প্লেটোর রিপাবলিক' বইটির বাংলা অনুবাদ উপহার দিতে। সঙ্গে ছিলেন ওই গ্রন্থের প্রকাশক 'বর্ণ মিছিল'-এর জনাব তাজুল ইসলাম। প্লেটোর রিপাবলিক বিভিন্ন বিদ্যার একটি মৌলিক গ্রন্থ। এটি অনুবাদ করে সরদার ফজলুল করিম আমাদের নির্মীয়মাণ সাহিত্যের এক মহাউপকার সাধন করেছেন। প্রকাশনার এমন ব্যয়বহুল অবস্থায় এ বিরাট বইটি প্রকাশ করে 'বর্ণ মিছিল'ও আমাদের সাহিত্যের এক দীর্ঘস্থায়ী উপকার যে করলো তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা থাকতে থাকতেই কবি তালিম হোসেন এলেন। বর্তমানে তিনি নজরুল একাডেমির সম্পাদক। তিনি আগের দিনও এসেছিলেন। আজ সাড়ে দশটায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাৎকার। এ তিনি জানতেন।

মরহুম কবি ফররুখ আহমদ ঢাকা বেতারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সুবাদে একটি সরকারি বাড়ি তিনি পেয়েছিলেন। সপরিবারে সে বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাছে তাঁর পরিবারবর্গকে গৃহচ্যুত করা হয় কিনা স্বভাবতই তাঁর বন্ধু আর হিতৈষীরা এ দুশ্চিন্তায় ভাবিত হয়ে পড়েন। ওঁদের যাতে গৃহচ্যুত করা না হয় এ অনুরোধটি যেন আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানাই–তালিম হোসেন এ কথাটি বলতেই ফের এসেছিলেন। এর মধ্যে একদিন জনাব ফেরদৌস খান এসে বলে গেছেন–আপনার সঙ্গে যখন প্রধানমন্ত্রীর দেখা হবে তখন দয়া করে শিক্ষা কমিশনের কথা একবার জিজ্ঞাসা করবেন, অর্থাৎ ওই কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁরা কিছু করবেন কিনা তা জেনে নেবেন।

গণভবনের দরজায় নামতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল এক সুদর্শন তরুণের সাথে। তরুণটি এগিয়ে এসে সালাম জানিয়ে বললো–

: আমি আনোয়ার হোসেন, ইত্তেফাকের মানিক মিয়ার ছেলে।

মানিক মিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আনোয়ার হোসেন (মঞ্জু)! ও যখন ছাত্র ছিল তখন একবার ওকে দেখেছিলাম।

বললাম–

: ও, তুমি মঞ্জু, আমার মেয়ের সহপাঠি ছিলে।

হ্যাঁ স্যার। সাড়ে দশটায় তো প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সাক্ষাৎকারের কথা।

: হ্যাঁ। তুমিও তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলে বুঝি?

না। অন্য কাজে এসেছিলাম। তবে তাঁর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

গাইড আমাকে উপরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

এবার আমি এসেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ তহবিলে কিছু অর্থ সাহায্য চাইতে। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন। আজ আবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি ব্যক্তিগত সচিবকে ডেকে কথাটা নোট করে রাখতে বলে দিলেন।

ফররুখ আহমদের বাড়িটা ওঁর ছেলের নামে বরাদ্দ করে দিতে আর ওঁর পরিবারবর্গকে কিছু আর্থিক সাহায্য দানের অনুরোধ জানালাম। সচিবকে বলে দিলেন আমার এ অনুরোধটিও টুকে রাখতে। পরে জেনেছি এ দুই অনুরোধ শেখসাহেব রেখেছেন অর্থাৎ বাড়িটি ফররুখের ছেলের নামে অ্যালট করে দিতে বলে দিয়েছেন এবং ফররুখ আহমদের পরিবারকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন। তবে তাঁর প্রথম নির্দেশটা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের গাফিলতির জন্য আজো নাকি বাস্তবায়িত হয়নি।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের কী দশা জিজ্ঞাসা করতেই

বললেন—

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ পরীক্ষা আর বাস্তবায়নের জন্য একটি সেল করা হচ্ছে আর তার প্রধান করা হবে ফেরদৌস খানকে।

তাঁর এ সিদ্ধান্তের কথা তিনি নাকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি যখন জানালাম ফেরদৌস খান ওই মর্মে এখনও পর্যন্ত কোনো নির্দেশ পাননি, সচিবকে ডেকে এ ব্যাপারেও নোট করে রাখতে বলে দিলেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা যাতায়াত অর্থাৎ যানবাহনের। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার (বি.আর.টি.সি'র) কিছু বাস যেন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে চলাচল করে সে ধরনের একটা নির্দেশ দানের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম। তিনি সচিবকে আমার এ অনুরোধটাও লিখে রাখতে বলে দিলেন। আর বললেন বি.আর.টি.সি'র চেয়ারম্যানকে যেন এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ-ও লেখা হলো সচিবের ডায়রিতে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি আজো।

আট

৩১-১২-৭৪

এদিনও সকাল ১০টায় গণভবনে শেখসাহেবের সাথে দেখা হলো। আজ অনেককিছু আলাপ করার নিয়ত করে এসেছিলাম। টুকে এনেছিলাম আলোচ্য বিষয়গুলো। কয়েকদিন আগে এক পরিচিত সাংবাদিক দেখা করতে এসেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, কয়েকদিন আগে তিনি নেপাল থেকে ফিরেছেন, পরে ঘুরে এসেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম। বললেন—

: মনে হলো বাংলাদেশ-নেপাল সীমান্ত অরক্ষিত, কোনো রকম পাহারার ব্যবস্থা নেই, খানাতল্লাশি নেই, এমনকি স্যুট্‌কেসটাও কেউ একবার খুলে দেখে না। মনে হয় পাকিস্তানি গুপ্তচরেরা এ পথেই ওদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে থাকে। আশুগঞ্জ সার কারখানায় যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার পেছনেও ওদের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামেও পাহাড়িদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখে এলাম। বাংলাদেশের ইনটেলিজেন্স তথা গোয়েন্দা বিভাগ খুব দুর্বল বলে মনে হয়।

সাংবাদিক বন্ধুটি শেষকালে বললেন, শেখসাহেব এসব কথা জানেন কিনা জানি না। এসব দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এসব কথা আমার মনে ছিল, এসব কথাও শেখসাহেবকে বললাম। নেপালি সীমান্তের কথা শুনে তিনি যেন কিছুটা ভাবিত

হলেন। হ্যাঁ-না কিছু মন্তব্য করলেন না।

যেসব কথা আমার মনে আনাগোনা করতো এবার তারও কিছু কথা না বলে পারলাম না। বললাম–

যেসব বাঙালি আটকা পড়ে আছে তাঁদের ফিরিয়ে আনুন না, তাহলে ওঁরা কোনোরকম ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত হবে না, ওঁদের কাছ থেকে পাকিস্তানিরা পাবে না কোনো মদদ। মাহমুদ আলী, হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুল জব্বার খদ্দর–এমনি কয়েকজনের নামও উল্লেখ করলাম। এঁরা প্রায় সবাই কাজের লোক। এঁদের সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে, এটা আমার অন্যতম দুঃখ।

শেখ বললেন, ওরা আমার কাছে লিখলেই পারে। তখন আমি অনুমতি দিয়ে দেবো।

খদ্দর সাহেবের এক ছেলে ঢাকা বিমানবন্দরে কাজ করে। চাটগাঁ ফেরার পথে ওকে আমি ডেকে বলেছিলাম তার বাবাকে এসব কথা লিখতে। খদ্দরসাহেব আমারও পরিচিত।

শফিউল আজমকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের কথা আগেও কয়েক দফা বলেছি, এবারও ফের বললাম। বললাম, উপযুক্ত অফিসারদের এত অভাব রয়েছে, এ অবস্থায় শফিউল আজমের মতো অফিসারদের নিয়োগ না করার কোনো মানে হয় না। ইতিপূর্বে আর একবার পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একইসঙ্গে শফিউল আজম, খাজা ওয়াসীউদ্দিন ও এ. কে. এম. আহসানের কথাও উত্থাপন করে এঁদের যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার ব্যবহারের কথা বলেছিলাম। খাজা উয়াসীউদ্দিন সম্বন্ধে শেখসাহেবের মন্তব্য–

দেখুন, আমরা দীর্ঘকাল ধরে নবাব পরিবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছি। তার ওপর ও বিয়ে করেছে পাকিস্তানে, ওদের পরিবার পাকিস্তানে থাকে, ওদের সব সম্পর্ক পাকিস্তানের

সঙ্গে, অধিকন্তু ও বাংলা বলতে পারে না, আর আমার আর্মি হলো বাঙালিদের নিয়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মাটিতে যার শিকড় নেই তাকে কী করে আমি বাঙালি আর্মির প্রধান করি?

মনে মনে তাঁর যুক্তির সারবত্তা অন্তত কিছুটা না মেনে আমি পারলাম না।

শফিউল আজম সম্বন্ধে বললেন–

দেখুন পাকিস্তানিরা যখন বাংলাদেশে আক্রমণ চালিয়েছিল তখন ওরা traitor নামে এক ডকুমেন্টারি করেছিল। তাতে শফিউল আজম নিয়েছিল অংশ। ওই বইতে ওর ছবি আছে, ইত্যাদি।

আহসান সম্বন্ধে বললেন–

: আহসান যদি আরো আগে ফিরে আসতো, ওকে আমি আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারতাম। এখনো অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ওকে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা দপ্তরের কৃষি উন্নয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব এখন ওর ওপর। তবে ওর কিছু দোষ যে নেই তা নয়...

আমি বুঝতে পারলাম। তাই কোনো মন্তব্য করলাম না।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অনুরোধও জানালাম তাঁকে। বললেন–

দেখি কী করা যায়। কিছু ক্ষতিপূরণ আদায় না করে খালি হাতে ছেড়ে দিই কী করে?

বাঙালিরা সবেমাত্র এক পা এক পা করে পাটশিল্পের দিকে এগোচ্ছিল। পাটের বাজারে তারা এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এ অবস্থায় তাদের জুটমিলগুলো জাতীয়করণ সঙ্গত হয়নি। ওইগুলো অন্তত ছেড়ে দেওয়া উচিত। সেইসঙ্গে বললাম–

যদিও ওইসব ক্ষেত্রে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তবুও এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ বিষয়ে দেখলাম তিনি অনেকখানি অনড়। বললেন–

না, যা একবার জাতীয়করণ করা হয়েছে তা আর denationalise করা হবে না। তবে নতুন যেসব মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলো আর জাতীয়করণ করা হবে না। এখন কল-কারখানার জন্য আমরা উদারভাবে লাইসেন্স দিচ্ছি।

এর কিছুদিন আগে কোরবানির ঈদ গেছে। বললাম–

: ট্যানারিগুলো অচল হয়ে আছে বলে এবার কোরবানির চামড়া বিক্রি হয়েছে একদম পানির দরে। ফলে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে দেশের।

বললেন–

এগুলো পুনর্গঠনের চেষ্টা করছি আমরা। ওই ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞ লোক নেই বলে এ দুর্দশা। সামনে এ রকম আর হবে না। আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে অনেক বিষয়ে অনেক আলাপ হলো। তাঁকে কখনো অধৈর্য হতে দেখিনি। অন্তত আমার বেলায় তেমন কখনো ঘটেনি। অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল আমাকে মন্ত্রিসভায় নেবেন। স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তবে গতবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবারও করলেন আমি অন্য পদে আসতে রাজি কিনা। আমার একই উত্তর–

চাটগাঁর বাইরে কোনো এসাইন্‌মেন্ট নিতে আমি রাজি না। এ বয়সে আমি আমার ঘর ছাড়তে চাই না, তাতে আমার খুব কষ্ট হবে।

আজও সে কথাটা নতুন করে পাড়লেন। ইঙ্গিতটা বুঝতে

পেরে আমি কিছুটা শংকিত হলাম। এবারও সেই একই উত্তর দিলাম। বয়সের যুক্তিটাই বেশি করে দেখালাম। তিনি জোর করলেন না।

২-১-৭৫

গতকাল ঢাকা থেকে চাটগাঁ ফিরে এসেছি। মঞ্জুরি কমিশনের সভা ছিল, পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছি। মঞ্জুরি কমিশনের সভা শেষ করে ফেরার পথে ফেরদৌস খাঁর বাসায় নেমে তাকে বললাম–

শফিউল আজম সম্বন্ধে শেখসাহেবের সুর কিছুটা নরম হয়েছে মনে হলো। ডাক্তার নূরুল ইসলামকে (পিজির মহাপরিচালক} দিয়ে পার্সু করাতে হবে। তিনি তো শেখসাহেবের বাবাকে রোজই একবার করে দেখতে যান। আমি তাঁর বাসা চিনি না, তাই আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে।

ফেরদৌস সাহেব বললেন–

: খুব ভোরে না হলে ওঁকে ধরা যাবে না। আপনি তাহলে কাল খুব ভোরে আসুন। সাতটার আগে আসতে হবে, নাস্তা এখানেই করবেন।

৩-১-৭৫

আজ সকালে ফেরদৌসসাহেবকে নিয়ে ডাক্তার ইসলামের বাসায় গেলাম। ওখানেই নাস্তা করা গেলো। শেখসাহেবের বাবাকে দেখতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। গত রাতে ফোনে ফেরদৌস খান ওঁকে আমাদের আসার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন।

ডাক্তার ইসলামকে বললাম—

শফিউল আজম সম্বন্ধে আমি আবারও শেখসাহেবের সঙ্গে আলাপ করেছি। এবার সুর কিছু নরম মনে হলো। আর একটু চাপ দিতে পারলে কাজ হয়ে যেতে পারে। আপনি তো রোজই যাচ্ছেন। সুযোগমতো কথাটা পাড়বেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের জন্য কিছু চাঁদা আদায় করে দেওয়ার কথাও ডাক্তার ইসলামকে বললাম।

তিনি আশ্বাস দিলেন, নিজেও কিছু দেবেন আর তাঁর রোগী চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইব্রাহীম মিয়াকেও বলে দেবেন জানালেন।

দুপুরের ফ্লাইটে চাটগাঁ ফিরে এলাম। অধ্যাপকদের অনেকে দেখা করতে এলেন। এরই মধ্যে এখানে গুজব রটেছে আমি নাকি শিগ্‌গির মন্ত্রী হচ্ছি। গত মাসে দু'দিন—১১ আর ৩১ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তার থেকেই গুজবটার উৎপত্তি।

প্রধানমন্ত্রীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে আমি আমার মনের ভাব জানিয়ে দিয়েছি। চাটগাঁর বাইরে কোনো দায়িত্ব গ্রহণে আমার কোনো রকম আগ্রহ নেই। বলেছি তাতে আমার খুব অসুবিধা হবে।

তিনি আমার কথাটা অগ্রাহ্য করেননি।

যাঁরা দেখা করতে এলেন তাঁদের এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার যেটুকু আলাপ হয়েছে তা শুনিয়ে দিলাম। অনেকে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

৪-১-৭৫

মঞ্জুরি কমিশনের ৩১ তারিখের সভায় সব কর্মসূচির আলোচনা

শেষ করা যায়নি। তাই ৪ তারিখ আবার সভা ডাকা হয়েছে। চেয়ারম্যান ডক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। গতকাল সকালের বিমানে ঢাকা এসেছি। বিকেলে শেখসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এযাবৎ কোনো সমাবর্তন হয়নি। তাই সমাবর্তন করা একরকম অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। কারণ সমাবর্তনে চ্যান্সেলরের উপস্থিতি অপরিহার্য। এর কিছুদিন আগে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনার পর আজকেও ফের শফিউল আজমের কথা তুললাম। বললেন–

: আপনি যখন এত করে বলছেন, দেখি তাঁর সম্বন্ধে কিছু করা যায় কিনা। অন্তত পেনশনের ব্যবস্থাটা করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখি।

১১-২-৭৫

আগামীকাল কক্সবাজারে সরকারি উদ্যোগে একটি পপুলেশন তথা জনসংখ্যার ওপর সেমিনার হচ্ছে। আমার ওপর অনুরোধ আর তাগাদা এসেছে ওই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে। তাই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। কিন্তু যেতে হবে নাকি ঢাকা হয়ে। ঢাকা থেকে একদল হোমরা-চোমরাও অংশ নেবেন, একটি গোটা প্লেন এ উদ্দেশ্যে চার্টার্ড করা হয়েছে, আমাকেও ওঁদের সহযাত্রী হতে হবে। অধিকন্তু ওইদিন নাকি চাটগাঁ হয়ে কক্সবাজারে যাওয়ার কোনো

যাত্রীবাহী প্লেন নেই। তাই আমার জন্যও এ ব্যবস্থা। চাটগাঁ থেকে ঢাকা যাওয়ার আলাদা টিকিটও তাঁরা আমার জন্য যথাসময়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তাই সই। ঢাকা থেকে বিকেল আড়াইটার ফ্লাইট। কক্সবাজার বিমানবন্দরে নেমে দেখি প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর দাঁড়িয়ে। এর আগের দিন শেখসাহেব এসেছেন কক্সবাজার। তাহেরউদ্দিন ঠাকুরেরও আগমন তাঁর অন্যতম সঙ্গী হয়ে। আগামীকালের জনসংখ্যা সেমিনার তাঁরই উদ্বোধন করার কথা।

তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এগিয়ে এসে বললেন–

শেখসাহেব আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি আসছেন শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আমাকে বলেছেন আপনাকে সালাম জানাতে আর তাঁর কাছে ধরে নিয়ে যেতে। আমি বলেছি–আপনার সালাম আমি পৌঁছাতে পারবো, আপনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান সেকথাও বলতে পারবো, কিন্তু ধরে আনতে পারবো না।

অতি বুদ্ধিমান ঠাকুরের এ উত্তর শুনে হেসে উঠলাম। কক্সবাজার কলেজের অধ্যক্ষও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন–

: আপনি আসবেন শুনে আমরা কলেজে একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করছি। উপলক্ষ আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি। প্রতিমন্ত্রী সাহেবও থাকবেন। সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

আমার পুরনো বন্ধু দেওয়ান আজরফও সেমিনার উপলক্ষে আমাদের সহযাত্রী হয়ে এসেছেন। তাঁকেও আমন্ত্রণ জানানো হলো।

তাহেরউদ্দিন ঠাকুর বললেন–

এখন শেখসাহেবের কাছে গিয়ে লাভ নেই। সভাটা শেষ

করে তারপর আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো।

সময় তখন বিকেল সাড়ে চারটা-পাঁচটার মতো হতে পারে। কলেজীয় সভা-সমিতির উপযুক্ত সময়। অধ্যক্ষও জানালেন–

: আপনারা গেলেই সভা শুরু করা যাবে। সবকিছু প্রস্তুত।

তাতে আমাদেরও সুবিধা। প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি করে বিমানবন্দর থেকে আমরা সোজা কলেজে চলে এলাম। ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষকে হল টইটম্বুর। অনেক প্রবন্ধ পাঠ আর বক্তৃতা হলো। মাঝখানে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর উঠে গেলেন। বললেন–

আমি নামাজটা সেরে আসি। বুঝলাম তিনি নামাজি-কালামি লোক। রাজনৈতিক নামাজ কিনা বলতে পারবো না!

সভার কাজ শেষ হতে হতে বেশকিছু রাত হয়ে গেলো। ওখান থেকে তাহেরউদ্দিন আমাকে সোজা সার্কিট হাউসে শেখসাহেবের কাছে নিয়ে হাজির করলেন।

নয়

শেখসাহেব তখন সার্কিট হাউসের বারান্দায় গেঞ্জির উপর আলোয়ান জড়িয়ে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। আশপাশে কয়েকজন এমপিও রয়েছেন। শেখসাহেব তাঁদের সঙ্গে আলাপরত। চাটগাঁর তখনকার ডিসি জনাব এ বি চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। আমি যেতেই শেখসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে অত্যন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর পাশের চেয়ারে নিয়ে আমাকে বসালেন। বাচ্চা এসডিও আশফাকুর রহমান ফাইফরমাশ খাটছেন। শেখসাহেব এসডিওকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

এখানকার মুড়ি বেশ ভালো, মুড়ি নিয়ে এসো তেল-পেঁয়াজ দিয়ে মেখে।

মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বভাব শেখসাহেব কখনো ছাড়তে পারেননি–খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ছিলেন তাই। একটা দেশের রাষ্ট্রপতিসুলভ ব্যবহার তাঁর মধ্যে আমি কখনো দেখিনি। আমৃত্যু তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালিই থেকে গেলেন। ধামাভরা গরম গরম মুড়ি এলো। পেঁয়াজ ছাড়ানো তেলে মাখা। উপস্থিত সবাই মিলে একই ধামা থেকে পরম আনন্দে মুঠি মুঠি খেতে লাগলাম শুধু নয়, উপভোগ করে খেতে লাগলাম। শেখসাহেবের এক এক মুঠ তিন মুঠের সমান। মনে হলো মুড়ি শেখের প্রিয় খাদ্য। কবি জসীমউদ্‌দীনও ফরিদপুরের মানুষ, দেখেছি তিনিও মুড়ির অত্যন্ত

ভক্ত। জসীম তো মুড়ির ঠোঙ্গা হাতে পথ চলতে চলতেই মুড়ি চিবাতো। শুনেছি তার বাড়ি গেলে সর্বাগ্রে বাসনভরতি মুড়িই সামনে দেওয়া হতো, আর তার বেশিরভাগ ও নিজেই সাবাড় করতো।

কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ ডিসি বললেন–

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনেক অনাবাদী জমি পড়ে রয়েছে, মাত্র দু'তিন লাখ টাকা খরচ করে একটা বাঁধ দিতে পারলে ওইসব জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যাবে।

সায় দিয়ে আমিও বললাম–

: তাহলে খুব ভালো হয়।

শেখসাহেব জানতে চাইলেন–

: কত টাকা লাগবে? দু'লাখে হবে?

আমি বললাম–

: তিন লাখ দিয়ে দিন। তাতেই বোধ হয় হয়ে যাবে।

ডিসি'র দিকে ফিরে জানতে চাইলাম–

: ডিসি সাহেব কী বলেন?

ডিসিও আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন–

: তিন লাখে হয়ে যাবে।

সচিবকে তখনই ডেকে পাঠালেন শেখসাহেব। সচিব ফরাশউদ্দীন বোধ হয় কাছেই ছিলেন। এসে দাঁড়াতেই বললেন–

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিন লাখ টাকা মঞ্জুর করা হলো। লিখে রাখো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম–

আপনার অনেক আদেশ কিন্তু দেখেছি বাস্তবায়িত হয় না।

আপনি গুড ফেইথে অনেক হুকুম দিয়ে থাকেন, তার সব ক'টি কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হয় না। আমার বিশ্বাস আপনার সব আদেশ যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে না। তাই এমন ঘটে থাকে।

তিনি কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন–

: আমার কোন আদেশ কার্যকর হয় নি?

বললাম–

আপনি তো আমাকে বলেছিলেন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য আপনি আদেশ দিয়েছেন, একটা সেল করেছেন আর ফেরদৌস খানকে বাস্তবায়ন কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু ফেরদৌস খান আজ পর্যন্ত ওই মর্মে কোনো আদেশ পাননি।

আমার এ কথায় মনে হলো তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। তাই স্পষ্ট কিছু বলতে পারলেন না। বললেনও না। আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে কিছু প্রশাসনিক বট্‌লনেক রয়েছে। না হয় কবে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট করা হয়েছে, এখনো তার বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

রাত হয়ে যাচ্ছে, আর বোধ করছিলাম বেজায় ক্লান্তি।

বললাম–

: আমি উঠি। রাত অনেক হলো।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–

: আচ্ছা।

সচিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

: এঁর জন্য গাড়ি আছে তো?

বললাম–

ও হয়ে যাবে। তাহেরউদ্দীন নিয়ে এসেছেন, তিনিই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

গাড়িতে উঠতে যাওয়ার সময় সচিব ফরাশ অনুযোগের সুরে বললেন—

আপনি স্যার আমরা যা করতে পারিনি তারই শুধু উল্লেখ করলেন। আমরা যা করেছি তার কিছু বললেন না। আমি নিজে গিয়ে কবি ফররুখ আহমদের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এসেছি। এ রকম আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন তিনি।

পরদিন সকালে সেমিনার করে বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে আসবো।

বিমানবন্দরে এসে দেখি আমার বাল্যবন্ধু জাফর আলম চৌধুরী দাঁড়িয়ে। তিনি একটি লাগেজ টিকিট আমার হাতে দিয়ে বললেন—

একটি ছোট ডেকচি বুক করে দিয়েছি। আজ ভোররাতে পুকুর থেকে একটি রুইমাছ ধরা হয়েছে। গিন্নি সেটি রান্না করে দিয়েছেন।

জাফর আলম চৌধুরী একটি বাগান করেছেন, তাতে অন্যান্য ফলফলারির সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় মসলা ইত্যাদি উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন, যেমন লং, এলাচ, দারচিনি, গোলমরিচ, তেজপাতা ইত্যাদি। তারও কিছু নমুনা আমার হাতে দিলেন বাড়িতে গিন্নিকে দেখাতে।

খোঁচা দিয়ে কথা বলার ফলেই বোধকরি সে তিন লাখ টাকার মঞ্জুরি আসতে কিছুমাত্র দেরি হলো না। এ টাকা দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটা পুকুর আর বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছি।

৬-৩-৭৫

আজও প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। তাঁর বাবার হঠাৎ অসুখ বৃদ্ধির খবর পেয়ে তিনি খুলনা চলে গেছেন। তাঁর বাবা তখন ছোট ছেলের কাছে খুলনায় ছিলেন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর সব এনগেজমেন্ট বাতিল, এ খবর সেদিনের কাগজে দেখে বুঝতে পারলাম তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তিনি ঢাকা-খুলনা আসা-যাওয়া করছেন এ-বেলা ও -বেলা। তার ওপর রয়েছে রাষ্ট্রীয় জরুরি কাজকর্ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজ সেরে আমি চাটগাঁ ফিরে এলাম পরের দিন।

শেখসাহেবের সঙ্গে আমার আরও দু'একবার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। এখন ডায়রি উল্টিয়ে দেখছি সব সাক্ষাৎকারের কথা ডায়রিতে লেখা হয়নি।

একটি সাক্ষাৎকারের সময় আমি একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়েছিলাম, সেটি এখন মনে পড়ছে। আমার দ্বিতীয় ছেলে আবুল মনজুর পাস করার পর এখানে-ওখানে এটা-ওটা করে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছে। স্থায়ীভাবে কিছু একটা ধরেনি। ওর জীবিকা সম্পর্কে আমরা তাই খুব চিন্তিত। চাকরির প্রতি ওর একটা স্বাভাবিক অনীহা রয়েছে। ব্যবসা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য নয়, অথচ ও চায় ব্যবসা করতে। আমাদের পরিচিত জগৎ বই আর কাগজপত্রে সীমিত। তাই ঠিক হলো ও প্রথমে কাগজের একটা ডিলারশিপ নিয়ে আরম্ভ করুক, ভালো করতে পারলে পরে বইপুস্তকের দিকে ওটাকে সম্প্রসারিত করা যাবে। যথাবিধি কর্ণফুলী পেপারের ডিলারশিপের জন্য দরখাস্ত করা হলো। সব শর্ত পূরণ করাও হলো। যথানিয়মে কিছু হচ্ছে না দেখে মঞ্জু প্রতিমন্ত্রীকে গিয়ে বললে তিনি সাফ জবাব দিলেন কিছু করতে

পারবেন না। এ প্রতিমন্ত্রী আমার ছাত্র এবং আত্মীয়ও। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব মঞ্জুকে বলেছে–

এসডিও-র সুপারিশ নিয়ে আসুন, আমি করে দিচ্ছি। এসডিও-র সুপারিশ নিয়ে যখন যাওয়া হলো তখন বলল–

স্থানীয় এমপি-র সুপারিশও দরকার। এমপি একজন তরুণ, মঞ্জুরও জুনিয়র। ওর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলো, সে নাকি কথাই বলতে চাইলনা। তাচ্ছিল্যভরে শুধু বলল–

আমার এলাকায় অনেক ডিলার রয়েছে, আর সুপারিশ করা যাবে না।

তরুণ এমপি আমার ছেলেকেও চেনে–আমাকেও।

তিন-চার মাসেও যখন কিছু হলো না তখন, ব্যাপারটি যদিও অতি সামান্য, অনেক দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে কথাটা আমি একদিন শেখসাহেবকে বললাম।

তিনি তো শুনে অবাক। তখন শেখ মণি ছিলেন ওখানে। ওকে বললেন–

: তুমি ওদের বলে দিও আমি বলেছি এটা করে দিতে।

মণি বলল–

আপনিই বরং ওদের ডেকে বলে দিন, আমার বলাটা সঙ্গত হবে না।

মণি চলে গেলো। শেখসাহেব সচিবকে ডেকে বললেন–

পেপার বোর্ড কর্পোরেশনের ওদেরকে ডেকে পাঠাও, না হয় এখনি ফোনে বলে দাও আবুল ফজল সাহেবের ছেলের ডিলারশিপের ব্যাপারটা যেন অবিলম্বে করে দেওয়া হয়।

আমি চলে আসার পর তিনি নাকি সচিবের কাছে মন্তব্য

করেছিলেন, 'আমি যেমন জীবনে কারও কাছে কিছু চাই নি, আবুল ফজল সাহেবও তো আমাদের কাছে কোনোদিন কিছু চাননি। আজ তাঁর ছেলের একটা সামান্য ডিলারশিপ হবে না—এ কেমন কথা!'

এরপর কোনো বাধা দেখা দেয়নি। যথাসময়ে ডিলারশিপ ওর হয়ে গিয়েছিল। পরে এটিকে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করেছিল ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। সংবাদপত্রে ওদের বিবৃতি দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন।

দশ

৯-৪-৭৫

আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আমি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলাম। আলোচ্য বিষয় ছিল–শিক্ষাসমস্যা আর পরীক্ষার ফলাফল। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল এত শোচনীয়ভাবে নিচে নেমে যাওয়ার পশ্চাদপট আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম সাংবাদিকদের সামনে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আর সরকারি শিক্ষানীতির সমালোচনাও করেছিলাম আমি ওই সাংবাদিক সম্মেলনে। ইতিপূর্বে ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু পাইকারিভাবে দেশের শিক্ষিত সমাজকে খুব করে নিন্দা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ না করে আমি তাঁর ওই মন্তব্যেরও সমালোচনা করেছিলাম কিছুটা কঠোর ভাষায়। পরদিন সব কাগজে আমার ওই সাংবাদিক সম্মেলনের সবিস্তার রিপোর্ট আমার ছবিসহ ছাপা হয়েছিল।

স্তাবকরা আমার এ সাংবাদিক সম্মেলনের কথা তিলকে তাল করে বঙ্গবন্ধুর কানে তুলেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া আমাদের অজানা। তবে তারপর থেকে একটা গুজব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ থেকে আমাকে সরানো হচ্ছে ইত্যাদি। ইতিমধ্যে কমনওয়েলথ কনফারেন্স উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু দেশের বাইরে গেছেন। তিনি ফিরে এলে এস্‌পার কি ওস্‌পার একটা কিছু হয়ে যাবে, একথা তখন সকলের মুখে মুখে। আমি নির্বিকার।

আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী একদিন আমার অফিসে খবর দিলেন তিনি আজ কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে নিরিবিলি আলাপ করতে চান। বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর কমিটির সভা ছিল, সভাশেষে তাঁতে আসতে বললাম। দেখা হতেই তিনি বললেন–

: স্যার, আপনার একটি সুখবর আছে।

পূর্ব-প্রচারিত গুজবের সঙ্গে এ 'সুখবরের' কিছু লিঙ্ক আছে মনে করে আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে উঠলাম। আমতা আমতা করে বললাম–

: এ বয়সে কী আর আমার সুখবর থাকতে পারে!

মোহাম্মদ আলী তখন সবিস্তার বললেন–তাঁর ভগ্নিপতি ডাক্তার নূরুল ইসলাম (পিজি'র ডিরেক্টর) ফোন করে জানিয়েছেন গতকাল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিনি কন্‌ফারেন্স শেষে জ্যামাইকা থেকে এসে শুনতে পান যে, আমাকে চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাবার চেষ্টা চলছে। কিছুমাত্র ইতস্তত না করে তিনি তখনই বঙ্গবন্ধুর কাছে ছুটে যান এবং তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন আমাকে সরালে প্রতিক্রিয়া মোটেও ভালো হবে না। আরো বহু কথার পর আমি যে তাঁর হিতৈষী তা-ও তিনি নাকি তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুও নাকি বলেছেন–'আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, পিতার মতো ভক্তি করি। অথচ তিনি নাকি আমার কথার সমালোচনা করেছেন কঠোর ভাষায়।'

ডাক্তার ইসলাম তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এগুলো সব লোকের বানানো কথা। তাঁরও আপনার সম্বন্ধে খুবই উঁচু ধারণা। শেষ কথা–আমাকে সরাবার সংকল্প আপাতত রাষ্ট্রপ্রধান ত্যাগ করেছেন। এটিই সুখবর। এ খবর আমাকে গোপনে জানাবার জন্য ডাক্তার ইসলাম তাঁকে বলে দিয়েছেন। কী জানি কেন মনে মনে

খুব ধিক্কার বোধ করলাম।

স্বাধীনতার পর কত জনকে বিপদমুক্ত করার জন্য কতভাবেই না আমি চেষ্টা করেছি, তদবির করেছি বহু ক্ষমতাসীনের কাছে। এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কাছেও দরবার করেছি বহুবার। আজ আমার একটা সামান্য চাকরি রাখার জন্য আমার একজন হিতৈষীকে কিনা উল্টো শেখসাহেবের কাছে ওকালতি করতে হচ্ছে আমার হয়ে! অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে। জীবিকার বন্ধন আমাদের আজ আত্মমর্যাদা রক্ষায়ও অপারগ করে তুলেছে। অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী যেটাকে সুখবর বলেছেন, সে সুখবর শুনে নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হলো।

২৬ -৬-৭৫

আজ সিন্ডিকেটের সভা। সভাশেষে এক পাশে ডেকে নিয়ে সৈয়দ আলী আহসান (তখন তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) আমাকে চুপি চুপি বললেন, তিনি ঢাকায় জেনে এসেছেন, দু'একদিনের মধ্যে নতুন উপাচার্যের নিয়োগ হচ্ছে। তিনি ফাইল পর্যন্ত দেখে এসেছেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে। ১ জুলাই ডক্টর এনামুল হক এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। মাত্র গতকালই তিনি ঢাকা থেকে ফিরেছেন এবং সবকিছু জেনে এসেছেন। অতএব একদম টাটকা খবর! আমাকে পরামর্শ দিলেন–

: আপনার তাড়াতাড়ি ঢাকা গিয়ে তদ্‌বির করা উচিত।

সেইসঙ্গে যোগ করলেন–

আপনি না থাকলে আমার পক্ষে খুব দুঃখের হবে। এখানে চাকরি করাও দুঃসাধ্য হবে।

রাগ হলে আমাদের মুখে অনেক সময় ইংরেজি এসে যায়। বললাম–

I am the last person to make this sort of tadbeer. তবে ২৮ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মিটিঙে আমি যাচ্ছি, তখন একবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবো। সাক্ষাৎকার চেয়ে আজই ফোন করতে সেক্রেটারিকে বলে দেবো।

তিনি বিদায় নিলেন।

মনে মনে খুব বিরক্ত বোধ করছিলাম। আমি তো উপাচার্য হতে চাইনি। বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে এ দায়িত্ব নিতে বলেছেন। আমি নিয়েছি। এখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তিনি তো আমাকে ডেকে বলতে পারেন।

বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিবকে ফোন করে আমার ইচ্ছা জানানো হলো। বঙ্গবন্ধু ২৯ তারিখ সন্ধ্যে ৬টায় আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন।

২৭ তারিখ ডক্টর এনামুল হককে ফোন করলাম। বললাম–

২৮ তারিখ আমাকে গণভবনে যেতে হবে, দয়া করে আপনার গাড়িটা ওইদিন ৫টার সময় আমার মেয়ের বাসায় পাঠাবেন।

তিনি যথাসময়ে গাড়ি পাঠাবেন আশ্বাস দিলেন। তখন কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করলাম–

আপনি নাকি এখানে আসছেন? আর পহেলা জুলাই তারিখ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নিচ্ছেন?

শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন–

আমি তো কিছুই জানি না। মাত্র একদিন আগে গণভবনে আমি এক ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি। শিক্ষামন্ত্রীও তখন ওখানে

উপস্থিত ছিলেন। কেউ তো আমাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেননি। আমাকে সরাসরি চাটগাঁ চালান দেয়া হচ্ছে অথচ আমি কিছুই জানিনা!

তখন আমার বুঝতে বাকি থাকলো না, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই বোগাস।

এগারো

২৮-৬-৭৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মিটিং শুরু হলো বেলা ৩ টায়। ৫টা পর্যন্ত থেকে আমি কেটে পড়লাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য কেনা টয়োটা করোনায় চড়ে ঠিক ৫-৩০টায় গণভবনের দিকে রওয়ানা দিলাম। শেখসাহেবের ১৯৬৯-এ লেখা দু'খানা চিঠি আমার পুরনো ফাইলে ছিল (চিঠি দু'খানা বইয়ের প্রথমেই সন্নিবেশিত করা হয়েছে)।

ফাইল ঘেঁটে বের করে সে চিঠি দু'খানাও পকেটে করে নিয়ে এসেছি।

ওয়েটিং রুমে আমার পেছনে পেছনে ঢুকলেন মহীউদ্দিন আহম্মদ। আমার প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। কারা যেন দল বেঁধে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানাতে এসেছে। ওদের পালা শেষ হতেই সচিব এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। দেখেছি সবসময় সাক্ষাৎকার কিংবা সভা-সমিতির ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে সময়সূচি রক্ষা করে চলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমাকে অন্তত বসে থাকতে হয়নি কখনো।

ঢুকতেই বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ আন্তরিকতার সাথে

আস্‌সালামু আলায়কুম বলে এগিয়ে এসে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন। আসন না নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি বলে উঠলাম—

: আজ আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতেই এসেছি।

তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—

: কেন? কি করেছি আমি?

বললাম—

এসব কী শুনছি? আপনি নাকি আমার স্থলে নতুন একজন উপাচার্য পাঠাচ্ছেন অথচ আমাকে কিছু বলেননি!

তিনি অধিকতর অবাক হয়ে বললেন—

এ খবর আপনাকে কে দিলো? আমরা তো এমন কোনো কথা বলিনি। এমন কথা মুখ থেকেও তো আমরা বার করিনি একবারও।

নিজে থেকেই বললেন—

আপনাকে তো আমি নিজে থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নিতে বলেছি। আর আজ আপনাকে না জানিয়েই ওই পদ থেকে সরিয়ে দেবো এমন কথা আপনি বিশ্বাস করলেন কী করে?

সেদিন আমি কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম। সে অবস্থায় মুখে অনেক কথা এসে গেলো।

বললাম—

আমি রাজনীতিবিদ নই, কোনোদিন করিওনি রাজনীতি। তবে যখন দেশের ডাক এসেছে, সবসময় আমি সাড়া দিয়েছি। এমনকি আওয়ামী লীগের ডাকেও বিভিন্ন সময় কীভাবে সাড়া দিয়েছি আমি তারও বিবরণ বয়ান করে গেলাম একটানা। এবার

পকেট থেকে সে পুরনো চিঠি দু'খানা বের করে তাঁর সামনে খুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম–

এ চিঠি কি আপনি লেখেননি? তখন আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি হবেন তা হয়তো ভাবেননি, দেশের মানুষও তা কল্পনা করেনি। আপনি বঙ্গবন্ধু হবেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে আর আপনি সে স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন এসব তো সেদিন স্বপ্নের বস্তু ছিল। সেদিন আপনি ছিলেন স্রেফ এক বিরোধী দলের নেতা। অবশ্য সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা। আয়ুবীয় সামরিক শাসনের প্রচণ্ড দাপটের দিনে আপনারা যখন সবাই জেলে, সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে সভাপতিত্ব করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা যখন কাকেও খুঁজে পাননি তখন চাটগাঁ থেকে হাওয়াই জাহাজে করে আমাকে কি নিয়ে আসা হয়নি? আমার সেদিনের লিখিত ভাষণ আওয়ামী লীগ কি পুস্তিকা আকারে ছেপে সারা দেশে বিলি করেনি? আপনারা কি জেলে বসে তা পড়েননি?

উত্তেজিত অবস্থায় সেদিন একটানা অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম শেখসাহেবকে।

মনে হলো মিথ্যা গুজবের কথা শুনে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন।

বললাম–

: অমুক সাহেব তো ফাইল পর্যন্ত দেখে গেছেন বললেন।

অবাক কণ্ঠে বললেন–

কী ফাইল? আমার এখানে তো আপনার সম্বন্ধে কোনো ফাইল নেই। সব মিথ্যা কথা। আপনাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আপনাকে অপমান করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি আপনার সম্বন্ধে কিছুই করবো না। আপনি

থাকতে চান, পাঁচ বছর সাত বছর থাকুন না উপাচার্য।

হাসতে হাসলে বললাম–

: অতদিন কি আমি বাঁচাবো? বাঁচলেও কর্মশক্তি কি থাকবে?

বাঁচবেন, বাঁচবেন। মা'শাআল্লাহ্ শরীর তো ভালোই দেখাচ্ছে।

আজ বঙ্গবন্ধুর সাথে মন খুলে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম। মন ভারমুক্ত হলো। আশ্বস্ত বোধ করলাম। আরও আরও আশ্বস্ত হলাম তিনি যখন বললেন–

আপনাকে আমি বাকশালে যোগ দিতে বলবোনা। তবে আপনার কোনো শিক্ষক যদি যোগ দিতে চান তাকে আপনি বাধা দেবেননা।

বললাম–

: তা কেন আমি দিতে যাবো? যার যার স্বাধীন মতামতে আমি কেন শুধু শুধু হস্তক্ষেপ করতে যাবো?

যে প্রেস কন্‌ফারেন্স থেকে এতসব গুজবের উৎপত্তি, সে সম্বন্ধেও তাঁর সঙ্গে এবার খোলাখুলি আলাপ হলো। বললেন–

আমার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের বক্তৃতা আর আপনার প্রেস কন্‌ফারেন্স খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে হয়েছে বলে লোকে আপনার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ পেয়েছে। এটা একটা coincidence।

বুঝতে পারলাম তাঁকে কেউ কেউ বুঝিয়েছে আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছি। আজকের আলাপের ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটলো।

অন্য দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করে আছে। সচিবরা ঘন ঘন উঁকি দিচ্ছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি। বুঝতেও পারছি ওদের ইঙ্গিত।

অতএব আমি উঠে পড়লাম। তিনিও উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন—

: আপনি কী করে বিশ্বাস করতে পারলেন যে, আমি আপনাকে অপমান করতে পারি? আপনার কাছে আমি জানতে চাই এমন কথা আপনি বিশ্বাস করলেন কী করে? আমার সম্বন্ধে আপনি কী করে এমন একটা ধারণা করতে পারলেন? এ সম্বন্ধে আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। আশা করি আমার এ চ্যালেঞ্জের কথা আপনি লিখবেন।

আমি লেখার আশ্বাস দিয়ে দুই প্রশস্ত ও বলিষ্ঠ হাতে হাত মিলিয়ে বেশ হাল্কা মনে বেরিয়ে এলাম গণভবন থেকে। সঙ্গে নিয়ে এলাম বঙ্গবন্ধুর কিছু নতুন পরিচয়।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার আজকের সাক্ষাৎকারের কথা ঢাকা এবং চাটগাঁয় অনেকে জানতেন। ফলাফলের জন্য সবাই যেন উদগ্রীব। আমি ঢাকা যাত্রার পর মিনিটে মিনিটে নাকি আমার বাসায় ফোন আসছিল। সবাই একই প্রশ্ন—কী হলো? কী খবর? স্যার কি ফিরছেন? কোনো খবর দিয়েছেন? অর্থাৎ আমি আছি কি নেই এটুকুই সবাই জানতে চায়। এ খবরের জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত।

অনেকের বিশ্বাস এ খবরের ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। তাই এত উৎকণ্ঠা, মহলবিশেষে এত উৎসাহও।

সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনে অনেকে নিশ্চিন্ত হলেন, কেউ কেউ হলেন ভয়ানকভাবে হতাশ। মানবচরিত্র এত রহস্যময় যে তার হদিশ পাওয়া মুশকিল।

বারো

১৫-৮-৭৫

আজ ১৫ আগস্ট। শুক্রবার। মুসলমানদের জন্য সপ্তাহের পবিত্রতম দিন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যাওয়ার কথা। এজন্য সাজসজ্জা, তোড়জোড় চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। রাষ্ট্রপতিকে যথোপযুক্তভাবে সংবর্ধনা জানানোর জন্য শিক্ষক-ছাত্রদের মহড়াও নাকি হয়ে গেছে কয়েক দফা। এ পরিদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে স্বয়ং শেখসাহেবও ছিলেন সচেতন। ইতিপূর্বে কোনো চ্যান্সেলর এভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেননি।

এ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি কী বলবেন, কী বলা উচিত হবে ইত্যাদি ব্যাপারে আগের দিন তিনি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদের আলাপ-আলোচনার জন্য এক বৈঠক করেছেন। আলাপ-আলোচনার পর নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অনার্স পরীক্ষায় যারা সবচেয়ে ভালো ফল করবে তাদের জন্য ২০টি আর আলাদাভাবে মেয়েদের জন্য ৫টি উচ্চমানের বৃত্তি ঘোষণা করবেন। আর এসব ছেলেমেয়েদের অবশিষ্ট শিক্ষাজীবনের সব খরচ রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকেই বহন করা হবে। এসব বৃত্তি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সীমিত থাকবে না, বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাই হবে এসব বৃত্তির হকদার। অর্থাৎ এসব বৃত্তির জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই করতে পারবে কম্পিট।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজকাল কোনোরকম গবেষণা করেনা বলে যত্রতত্র একটা বদনাম শোনাা যায়। তাই গবেষণাকর্মে উৎসাহ দেয়ার জন্যও কিছু একটা করা দরকার—শেখসাহেব কথাটা নিজেই বললেন। সিদ্ধান্তও নিলেন নিজে—শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা মূল্যবান গবেষণা করবেন তাঁদের নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে এবং উন্নততর গবেষণাকার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন হলে সে ব্যবস্থাও সরকার থেকেই করা হবে। এ গবেষণা বৃত্তি ও পুরস্কার স্রেফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত থাকবেনা—বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই হতে পারবেন এর দাবিদার। দেশে গবেষণা হোক এ আমি চাই। উপস্থিত মন্ত্রী আর সচিবরা তাঁর এ সিদ্ধান্তের প্রতিও তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁর ভাষণের জন্য নানা পরিসংখ্যান হাজির করেছিল, যেমন, প্রাইমারিতে কত ছাত্রছাত্রী পড়ে, মাধ্যমিকে কত, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়েই বা কত ইত্যাদি। ওইসব দেখে শেখসাহেব নাকি বলেছিলেন—পরিসংখ্যানভিত্তিক বক্তৃতা দেয়া আমার পোষাবেনা, আর ওই ধরনের বক্তৃতায় আমি অভ্যস্তও নই। পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি শুধু এটুকু জানতে চাই যে, পাকিস্তান আমলে বাজেটের শতকরা কত টাকা সামরিক খাতে আর কত টাকা শিক্ষা খাতে খরচ হতো আর এখন ঐ দুই খাতে তুলনামূলকভাবে আমরা কত খরচ করছি, এটুকুই আমার জানা দরকার। পরিশেষে আমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জিজ্ঞাসা করবো, সরকার তথা দেশের মানুষ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এত টাকা খরচ করছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশকে কী দিচ্ছে? ইত্যাদি।

মনে মনে সেদিনের ভাষণের এ খসড়া পরিকল্পনাটি শেখসাহেব করেছিলেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত একজনের মুখ থেকে এ কথা আমি শুনেছি। তিনি এখনো সরকারি চাকুরে। কিন্তু

মানুষ ভাবে এক, আল্লাহ করেন আর এক! অক্ষরে অক্ষরে তা ঘটে গেল সেদিন। ভোর ছ'টায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ। অবিশ্বাস্য এ দারুণ নির্মম সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মর্মাহত হয়ে পড়লাম। দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি নিজেও। তিনি তো শুধু একটি ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন সারা বাংলাদেশের সংগ্রামী চেতনার প্রতীক। গত পঁচিশ বছর ধরে মিশে গিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের সত্তার সঙ্গে। শেষের দিকে আমার নিজেরও অনেক স্মৃতি জড়িত হয়ে পড়েছিল তাঁর সঙ্গে। মাত্র একমাস আগে ১৫ জুলাই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা উৎসবে গণভবনের দরজায় তাঁর সঙ্গে দেখা। এ যে শেষ দেখা তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেদিন। পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য গণভবনের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

গাড়ি থেকে নেমে আমি আর ডক্টর এনামুল হক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই তিনি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর স্বাভাবিক উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন–

: আপনি চাটগাঁ থেকে এসেছেন, খুব খুশি হলাম।

পাশে দাঁড়ানো ছেলের দিকে ইশারা করে বললেন–

: ছেলেকে দোয়া করুন।

ছেলে শেখ কামাল জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলো আমার ও ডক্টর এনামুল হকের সঙ্গে।

মেহমানরা সবাই যখন আসন নিয়ে নাস্তা করে গল্প-গুজবে ব্যস্ত তখন শেখসাহেব বর-কনে, আত্মীয়স্বজন এবং নতুন বেয়াইকেও সঙ্গে নিয়ে মেহমানদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে করতে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেন দুই সারিতে বসা মেহমানদের মাঝখান দিয়ে। নতুন বেয়াইকে দেখিয়ে বললেন–

: ইনিই আমার বেয়াই।

এনামুল হক সাহেব ত্বরিত উত্তর দিলেন–

: দবিরউদ্দিনসাহেবকে তো বহুদিন থেকেই চিনি।

শেখসাহেব বললেন–

তখন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেই চিনতেন, আমার বেয়াই হিসেবে তো জানতেন না। এখন থেকে আমার বেয়াই হিসেবে জানুন।

বলে হেসে উঠলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয় হাসি।

আমাদের চাটগাঁয়ের কয়েকজনকে এক জায়গায় দেখে ঠাট্টা করে বলে উঠলেন–

চাটগাঁর মানুষদের এ এক দোষ, একজন আর একজনকে দেখলে এক জায়গায় এসে জড়ো হবেনই–বলে হাসতে হাসতে হেঁটে চললেন সামনের দিকে।

ডক্টর এনামুল হক আর আমি ছাড়া জাস্টিস ইদ্রিস আর চাটগাঁর এমপিদেরও কয়েকজন তখন একত্রে আলাপরত ছিলাম ওখানে।

যাঁর নামে আর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, যাঁকে দেশের মানুষ এতকাল 'বঙ্গবন্ধু' 'জাতির জনক' বলে অভিহিত করে এসেছে, যাঁর নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উচ্চারিত, দূর দেশেও যাঁর নাম সবচেয়ে সুপরিচিত, দেশের জন্য যাঁর অন্তহীন নির্যাতন ভোগ এদেশের নর-নারীর কারো অজানা নয়, সে মানুষটির এ কী ভাগ্য! এ কী পরিণতি! আকস্মিকভাবে আজ ভোরে ঢাকা বেতার কিনা ঘোষণা করলো–সে মানুষটিকে, সে পুরুষসিংহকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম–এ কি নিয়তির খেলা! না

আল্লার অনন্ত রহস্যের এ-ও আর এক রহস্য? Man proposes, God disposes—এ আপ্তবাক্যটাই শেষকালে সত্য হলো?

সামরিক বাহিনী খোন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি করেছে। তিনি শেখ মুজিবের দীর্ঘকালের সহকর্মী আর তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য! গণভবনের বিবাহোত্তর সংবর্ধনার অন্য আমন্ত্রিতদের সঙ্গে সেদিন তাঁকেও দেখেছিলাম! তাঁদের দীর্ঘদিনের নেতা আর দীর্ঘদিনের সহকর্মী শেখ মুজিবকে যেদিন সকালে হত্যা করা হয়েছে সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর ১৩জন সহকর্মী মন্ত্রী আর প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন! এঁরা সবাই শেখ মুজিবের তৈরি, তাঁর নিজের হাতে গড়া। তিনি না থাকলে তাঁদের অনেকের কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্বই থাকতো না। ক্ষমতা আর পদের প্রলোভন কি সবরকম মানবীয় আবেগ, অনুভূতি, বিবেক-বিবেচনা সমূলে বিনষ্ট করে দেয়? এজন্যই কি বলা হয়েছে Power is corrupting, power is degrading? না কি এ-ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা?

শোনা যাচ্ছে নির্বিচারে শেখ পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে।

শিশু-নারী কাউকে রেহাই দেয়া হয়নি। অন্তরের অন্তস্থলে স্বতঃই উচ্চারিত হলো—আল্লাহ এ যেন সত্য না হয়। পরে জানা গেছে বহুবারের বহু প্রার্থনার মতো আমার এ প্রার্থনাটাও আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি।

শেখ মুজিব প্রশাসক হিসেবে কিছু ভুল করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশ্বস্ত কারো অপরাধকে হয়তো তত গুরুত্ব দেননি। যোগ্যতা আর সিনিয়রিটি কখনো অগ্রাহ্য হয়েছে। কোনো কোনো অযোগ্য জুনিয়রদের পদোন্নতি ঘটেছে। হয়ত কিছুসংখ্যক স্বজন ও বশংবদ সুযোগ পেয়েছে। এসব অভিযোগ দিনে দিনে তাঁর বিরুদ্ধে

স্তূপীকৃত হয়েছে। নিয়োগ ও পদোন্নতির বেলায় সামরিক বাহিনীতে অবিচারটা নাকি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন তাঁদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক অফিসারও রয়েছেন যাঁদের বিনা কারণে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। এবং তাঁদের দাবি হয়েছে উপেক্ষিত। এসব বহুতর কারণে সামরিক বাহিনীতে ভিতরে ভিতরে গড়ে ওঠা বড় রকমের অসন্তোষ হয়তো এতে মদদ যুগিয়েছে। তবে এত আকস্মিকভাবে এমন একটা ঘটনা ঘটবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। এ আকস্মিকতাই সারা দেশকে করে দিয়েছে স্তব্ধ আর হতবাক।

যাই হোক, এ এক মহাসত্য যে, দোষে-গুণেই মানুষ। কোনো নেতৃত্বই সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। তবে বহুতর কারণে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব আর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসে। এ যুগে বাংলাদেশে এমন ব্যক্তিত্ব আর দ্বিতীয়টি জন্মাবে কিনা সন্দেহ। বাঙালি নেতৃত্বের এক অসাধারণ নিদর্শন শেখ মুজিব। এ নেতৃত্বের সবরকম সবলতা-দুর্বলতার তিনি ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভূ।

তেরো

বাঙালি জাতীয়তার জন্মদাতা আর সে চেতনার উদ্বোধক শেখ মুজিব। শেখ মুজিব না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব হতো না। হলেও বিলম্বিত হতো। বাঙালি এসবের জন্য চিরকাল ঋণী থাকবে তাঁর কাছে। তাঁর সমতুল্য নির্ভীক আর এমন দুঃসাহসী নেতা বাংলাদেশে আর দেখা যায়নি। অশেষ নির্যাতনের মুখেও অবনমিত হননি কোনোদিন তিনি। হননি এতটুকুন ভীত-শঙ্কিত। শেষকালে চরিত্রের এ নির্ভীকতাই হয়তো তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের সুরক্ষিত সরকারি বাড়িতে না থেকে তিনি থাকতেন নিজের অরক্ষিত বাড়িতে যেখানে নিরাপত্তার তেমন কোনো জোরদার ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে হত্যা করবে কিংবা হত্যা করতে পারে এমন চিন্তা তাঁর মনের ত্রিসীমানায়ও স্থান পায়নি কোনো দিন। তাই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ছিলেন সব সময়। তাঁর সম্বন্ধে বোধকরি কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে বার্নার্ড শ'র কথাটা প্রয়োগ করা যায়–It is dangerous to be too much confident. বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে যেখানে অন্যান্য মূল্যবোধের মতো রাজনৈতিক মূল্যবোধও এখনো দানা বাঁধেনি।

শেখ মুজিবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক উত্তাল

ও অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের, একটি ঘটনাবহুল অধ্যায়ের, অবসান ঘটলো।

এখন আমরা পা বাড়াচ্ছি এক অনিশ্চয়তার পথে।

২৩-৮-৭৫

শেখ মুজিব আর তাঁর পরিবারবর্গের নির্মম হত্যা আমাদের মনের ওপর খুন আর পাপের এক গুরুভার বোঝা যেন চাপিয়ে দিয়েছে। এ ভার আমরা অনেকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব না করে পারিনা। ফলে ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে আমাদের বিবেক। এ ভার মুক্ত হওয়ার এক নিষ্ফল প্রয়াসেই লেখা হয়েছে 'বিবেকের সংকট' প্রবন্ধটি—যা পরিশিষ্টে দেখতে পাওয়া যাবে।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। তবুও পারছি না বিবেককে এতটুকু হালকা করে তুলতে। এক দুর্বহ বোঝার ভারে বিবেক আমার স্তব্ধ ও বোবা হয়ে আছে এ ক'দিন। এ এক অকল্পনীয় পাপের বোঝা—আমার, আপনার, সারা বাংলাদেশের।

বাঙালি কোমলপ্রাণ, আবেগপ্রবণ, গান আর কবিতা-প্রিয় জাতি ইত্যাদি বিশেষণ শুনতে শুনতে অহেতুক একটা উচ্ছ্বাস আর অহমিকাবোধ যে এক সময় আমরা না করতাম তা নয়। এ যে কতবড় মিথ্যা আর স্বরচিত ফাঁকা এক অর্থহীন স্তোকবাক্য তা ১৯৭০-৭১-এর পাকিস্তানি হামলার সময় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালি যে নির্বিচারে নিজের পরিচিত, হিতৈষী ও নিকট-প্রতিবেশীর ওপর সুযোগ পেলে কতখানি নির্মম হতে পারে সে দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের যারা হত্যা করেছে তারাও এদেশের শিক্ষিত তরুণ, সুজলা-সুফলা কোমল-প্রকৃতি আর কবিতা-প্রাণ বাংলাদেশেরই সন্তান।

শেখ মুজিবের হত্যা সম্বন্ধে বিদেশি সাংবাদিকদের যে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয় এবারকার নির্মমতা পূর্বের যাবতীয় নির্মমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে-বাচ্চা, সদ্য বিবাহিতা তরুণী বধূ, এমনকি বাড়ির চাকর-ঝি পর্যন্ত কাউকেও নাকি রেহাই দেয়া হয়নি।

তবে জীবনে-মরণে শেখ মুজিব শেখ মুজিবই থেকে যাবেন। শত্রুর সম্মুখীন হতে দ্বিধা করেননি জীবনে কোনোদিন। পালাননি, পালিয়ে নিজের গা কি প্রাণ বাঁচাতে চাননি একবারও। অবধারিত মৃত্যু জেনেও পাকিস্তানি হামলার সে ভয়াবহ রাত্রেও (১৯৭১-এর ২৫ মার্চ) তিনি নিজের বাড়ি ছেড়ে আত্মরক্ষার জন্য সরে পড়েননি। তাঁর সহকর্মীরা সবাই সরে পড়তে পারলে তাঁর পক্ষে না পারার কোনো কারণই ছিলনা। তিনি ধরা দিয়েছেন। এ ধরা দেয়া যে নির্ঘাত মৃত্যুর হাতে ধরা দেয়া তাঁর পক্ষে তা বুঝতে না পারার কথা নয়। কিন্তু শেখ মুজিব চির অকুতোভয়, বারে বারে কারারুদ্ধ হয়েছেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসির আশঙ্কাও যে ছিল না তা নয়। সব জেনে-শুনেও পালাননি, তাঁর সারা রাজনৈতিক জীবনে একবারও তিনি আত্মগোপন করে থাকেননি। কোনোদিন করেননি আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি।

এবারও নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন। ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) যারা সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিল, তিনি হয়তো বিশ্বাস করতে পারেননি তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে এবং এত নির্মমভাবে এ মৃত্যুর থাবা যে তাঁর প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র (যার বয়স দশ-এগারোর বেশি নয়) পর্যন্ত প্রসারিত হবে এ তিনি কেন, কেউই ভাবতে পারেনি। কারো দূর-কল্পনায়ও এ চিন্তা আসার কথা নয়। Truth is stranger than fiction–এ উক্তির সত্যতা নতুন করে যেন প্রমাণিত হলো শেখের জীবনে। এমন হত্যার বিবরণ কোনো উপন্যাসে বর্ণিত হলে পাঠকেরা

অবাস্তব কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এ যে এক নির্জলা সত্য!

১৫ আগস্টের ভোররাত্রির নির্মমতা কারবালার নির্মমতাকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে। কারবালায় দু'পক্ষের হাতে অস্ত্র ছিল, তারা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর সে হত্যা কোনো অর্থেই ঠাণ্ডা রক্তে ছিল না। সৈনিকের পেশা শত্রুনিধন, তার হাতের অস্ত্র উত্তোলিত হয় শত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে। সে যখন হত্যা করে, তখন তা নৈতিক নিয়ম-কানুনের আওতায় থেকেই তা করে। সৈনিক তো খুনি নয়—তার হাতের অস্ত্র নিরস্ত্র নিরপরাধের ওপর উদ্যত হয় না। অথচ গত ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবের বাড়িতে তা-ই ঘটেছে। এ দিনের অপরাধ আর পাপ সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে আমাদের আতঙ্কটা বেশি, কারণ বৃহৎ অপরাধ আর বৃহৎ পাপ বিনা দণ্ডে যায় না। বাংলার মানুষকে সে দণ্ড একদিন একভাবে না একভাবে ভোগ করতেই হবে। এটিও আমার এক বড় রকমের আতঙ্ক।

যিশুখ্রিস্টকে হত্যার পাপের বোঝা ইহুদিরা আজো বয়ে বেড়াচ্ছে। শেখ মুজিব যিশু ছিলেন না কিন্তু ছিলেন মানুষ। তাঁর পরিবারের শিশুরা, ছেলেরা ও মেয়েরা সবাই মানুষ ছিল। ছিল আদম সন্তান। কোরআনে, আদমসন্তানদেরই বলা হয়েছে আশরাফুল মখ্‌লুকাৎ। ঝি-চাকরেরাও ব্যতিক্রম নয়। তাই স্বভাবতই মনে শঙ্কা জাগে—এ পাপের বোঝা বাঙালি আর বাংলাদেশকে না জানি কতকাল বইতে হয়। কারণ এ অপরাধ মানবতার বিরুদ্ধে, এ অপরাধের সীমা ব্যক্তিতে সীমিত থাকেনি। নিরপরাধের খুন বিনা বদলায় যায় না। সম্ভবত এটি এ যুগের বৃহত্তম নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। এমন হৃদয়হীন নির্মমতার নজির ইতিহাসে অন্যত্রও মিলবে কিনা সন্দেহ।

চৌদ্দ

২৬-৮-৭৫

বিশ্ববিধান এক রহস্যময় ব্যাপার। এ রহস্যের তল পাওয়া যায় না, এ প্রায় মানববুদ্ধির অতীত। তবে দেখা গেছে প্রকৃতি বা বিশ্ববিধান কোনো রকম চরমকেই দীর্ঘদিন বরদাশত করে না। যেভাবে শেখ মুজিব আর তাঁর পরিবারবর্গ আর আত্মীয়স্বজনকে অত্যন্ত অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করা হয়েছে তা প্রতিশোধের চরমতম এক ইতিহাস হয়ে থাকলো। এ চরম নির্মমতা কোন পরিণতিতে পৌঁছে কে জানে? দেখা গেছে সব চরমই ডেকে আনে বিনাশ। সে বিনাশ দেখা দেয় অত্যন্ত প্রচণ্ডতম মূর্তি নিয়ে। তাই দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি বার বার শঙ্কিত বোধ না করে পারি না।

আমার মনের একটি জিজ্ঞাসা, শেখ মুজিব কি কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন? বাংলাদেশের প্রতিটি নর-নারীর সত্তায় কি মিশে নেই তিনি? তাই মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সত্তারও একটা অংশ যেন ধসে গেলো।

বাংলাদেশের মানুষকে বাঙালি বলে পরিচয় দেওয়ার হিম্মৎ কে যুগিয়েছে? শেখ মুজিব ছাড়া এর কি দ্বিতীয় কোনো জবাব আছে? শেখ মুজিবকে হত্যা করা মানে, এক অর্থে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে হত্যা করা। তিনি ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের হিম্মৎ আর সংগ্রামের প্রতীক। কে আর বিপদ আর

সংগ্রামের দিনে বাঙালিকে বজ্রকণ্ঠে ডাক দেবে? যে পুরুষসিংহ সে ডাক দিয়ে সারাদেশকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করতে পারতেন, পারতেন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে, বিজয় পর্যন্ত সে ঐক্য অটুট রাখতে– তাঁকে আমরা নিজের হাতে হত্যা করেছি। ইতিহাসে এক অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকলাম আমরা চিরকালের জন্য।

এ পাপ আমাকে প্রতিদিন, প্রতি মূহূর্তে পীড়া দেয়। তাই এর উল্লেখ ফিরে ফিরে আসছে আমার এ রোজনামচায়।

বাংলাদেশে শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে হেমিংওয়ের এ উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করা যায়–Man is not made for defeat. Man can be destroyed, but not defeated.

যাঁরা বলেন শেখ মুজিবের পতন হয়েছে। তাঁরা ভুল বলেন। শেখ মুজিবের পতন হয়নি, শেখ মুজিবের পতন মানে বাংলাদেশের পতন। তা হতে পারে না। বলা যায় শেখ মুজিবের স্রেফ জৈব আর নশ্বর দেহটাকেই বিনষ্ট করা হয়েছে। করা হয়েছে ধ্বংস। শেখ মুজিবের পর যারা আবার সঠিক পথে বাংলাদেশকে চালাবেন তারা সবাই এক একজন ক্ষুদে শেখ মুজিব। তাঁর হাতের তৈরি মানুষ।

শেখ মুজিব বহু জনসভায় বহুবার ঘোষণা করেছেন–প্রয়োজন হলে বাংলার মানুষের জন্য তিনি শেষ রক্তবিন্দুও দান করবেন। যে অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর মুখ থেকে বার বার উচ্চারিত হয়েছে তা যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে এমন মর্মন্তুদ সত্য হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানতো? তিনি বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষের জন্য শুধু তাঁর নিজের নয় তাঁর বংশের শেষ রক্তবিন্দুও দান করে গেলেন। ইতিহাসে স্বদেশের জন্য এতবড় মূল্যদানের দ্বিতীয় নজির আছে কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশের মানুষ এ মূল্যদানের প্রতিদান দিতে

পারবে কি? এ বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ তেমন বিরাট কোনো ফল পাবে কিনা তা আজও বলার উপায় নেই, এখনো তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই স্বতঃই আশঙ্কা জাগে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম (রাজনৈতিক অর্থে) বাঙালির আত্মদানও বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। যে কোনো বৃহৎ ত্যাগকে সফল ও অর্থবহ করে তোলার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, মনে হয় তা আমাদের নেই।

'বহু রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবো'– শেখের এ উক্তি শেখ নিজেই সত্যে পরিণত করে গেলেন! জীবন দিয়ে জীবন-সত্য পালনের এমন অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তও অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নিঃসন্দেহে শেখ ছিলেন এ যুগের সর্বপ্রধান বাঙালি। সে সর্বপ্রধান বাঙালিকে আমরা বাঙালিরাই কিনা নিজের হাতে হত্যা করলাম! আশ্চর্য, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও সত্য হলো।

বাঙালিকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে কে যুগিয়েছিল সাহস? শেখ মুজিব নয় কি? বজ্রগর্ভ আর অমিত প্রেরণার উৎস 'জয়বাংলা' স্লোগান কে তুলে দিয়েছিল বাঙালির মুখে? শেখ মুজিব নয় কি? জিন্দাবাদে সে জোর, সে চেতনা, সে উদ্দীপনা কোথায়? জয়বাংলা প্রদীপ্ত শিখা, জিন্দাবাদ ধার করা এক মৃত বুলি। গ্রামবাংলার শতকরা নব্বইজন যার অর্থই বোঝে না। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মুসলমান শেখ মুজিব–এ কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। হিন্দু বাঙালিয়ানা আর মুসলমান বাঙালিয়ানায় কিছুটা পার্থক্য আছে। তাই মুসলমান কথাটা যোগ করলাম। তবে এ পার্থক্য সবসময় বিরোধমূলক নয়। শেখ মুজিবের বেলায় যেমন তা ছিল না। তাঁর সমগ্র মুসলিমানিত্ব নিয়েই তিনি এক পরিপূর্ণ বাঙালি ছিলেন। এমন বাঙালি বিরল। এ বিরল বাঙালিটিকেই কিনা হত্যা করা হয়েছে। আমরা নিজেরাই

করেছি। এ যেন নিজের অঙ্গ নিজে ছেদন করা।

৪-৯-৭৫

বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান আর তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যা ওখানে থেমে থাকেনি। তাঁর ভাই, ভাগিনা, ভগ্নিপতি ইত্যাদি বহু আত্মীয়স্বজনও এ হত্যার শিকার হয়েছেন। এঁরা কেউ কেউ শেখসাহেবের ক্ষমতার সুযোগ যে শুধু নিয়েছেন তা নয়, অনেকে সে সুযোগের অপব্যবহারও করেছেন নানাভাবে। শেখসাহেব কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, হয়তো সামলাতে পারেননি। শোনা যায় এঁদের কারো কারো দৌরাত্ম্য নাকি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবে এদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের অবদানও খাটো করে দেখার মতো নয়। আমি ঢাকার বাইরে থাকি বলে স্বচক্ষে দেখার তেমন সুযোগ ঘটেনি। শেখের মতো এতখানি জনপ্রিয়তা পৃথিবীর কোনো নেতা কিংবা রাষ্ট্রনায়ক পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। অথচ অতি অল্পকালের মধ্যে কী শোচনীয় পরিণতিই না তাঁর আর তাঁর কিছু আত্মীয়ের জীবনে নেমে এলো। তিনি সঠিক অর্থে শাসক হতে চাননি। সবসময় থেকেছেন, থাকতে চেয়েছেন জনপ্রিয় দলীয় নেতা। শাসক হওয়ার মতো দৃঢ়তা, মন-মেজাজ, দূরদর্শিতার ঘাটতি ছিল কী? একটা রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার পরও দলীয় নেতার ভূমিকা তিনি ছাড়তে পারেননি। দলীয় সদস্যরা, ছোট-বড় সবাই, আর দূর কিংবা নিকট-আত্মীয়রা একজোট হয়ে যেন তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে চেয়েছেন। ষোল আনায় খুশি থাকেননি কেউ কেউ, পেতে চেয়েছেন আঠারো আনা।

রাষ্ট্র পরিচালক দৃঢ়চিত্ত, নিরপেক্ষ আর দূরদর্শী না হলে তাঁর নিজের মানুষেরাই তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। শেখসাহেবের

বেলায়ও তাই হয়েছে। এ ধরনের আপনজনেরা নিজের হাতে কাকেও মারে না বটে কিন্তু মরার পথ তৈরি করে দেয়। তার অন্য শত্রুর চেয়ে এসব গৃহশত্রুদের থেকে বেশি করে সাবধান থাকতে হয়।

বিভীষণেরা সবসময় মারাত্মক ভূমিকা নিয়ে থাকে। শেখ ছদ্মবেশী, গৃহশত্রু সম্বন্ধে ছিলেন অন্ধ আর অনেকটা উদাসীন। যে কোনো ক্ষমতাসীনের পক্ষে শেখের জীবন থেকে পাঠ নেওয়া উচিত। সবসময় সাবধান থাকতে হয় আত্মীয়রূপী শত্রুদের কাছ থেকে। অনেক সময় আত্মীয়রা নিজেরাও হয়তো বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না কীভাবে তাঁরা নিজের পরম আত্মীয়েরও সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

আমার মনে হয় শেখের শত্রুতা করেছেন তাঁর নিকট-আত্মীয়রা, তাঁর আপনজনেরাই সবচেয়ে বেশি।

ক্ষমতা আর ক্ষমতার সুযোগ সন্ধান দুই-ই হয়ে থাকে অন্ধ। এরাই একদিন ডুবে মরে স্বখাত-সলিলে। শেখ পরিণাম ভেবে সবসময় কাজ করেননি। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে বড় রকমের কোনো রাজনৈতিক হত্যা ঘটেনি! শেখের জীবনের এ মর্মন্তুদ ট্রাজেডি দিয়েই তার সূচনা। দেশের জন্য এ এক দারুণ অশুভ আর এক ভয়াবহ সূচনা।

৪-১০-৭৫

সাম্প্রতিক ঘটনায় শেখসাহেবের হত্যা সম্পর্কে আমি অনবরত বিবেকের একটা দংশন অনুভব করছি। এত বড় একটা দ্বিতীয় কারবালা ঘটে গেলো দেশে, নির্মমতায় যে ঘটনার জুড়ি নেই ইতিহাসে। সে সম্পর্কে দেশের সর্বাপেক্ষা সচেতন অংশ শিক্ষিত আর বুদ্ধিজীবী সমাজ কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করছেন না, এ ভাবা

যায় না। আশ্চর্য, মননশীল লেখক-তরুণ কবিরা একটানা অতি নিরস ও নিষ্প্রাণ প্রেমের বা 'আমি তুমি' মার্কা কবিতা লিখে চলেছেন। যে 'আমি তুমি' অনির্দিষ্ট কায়াহীন ছায়ামাত্র। অন্যদের লেখায়ও এ ভয়াবহ বিয়োগান্ত নাটকের কোনো প্রতিফলন এযাবৎ দেখিনি। এত বড় একক ট্র্যাজিক ঘটনা তাঁরা আর কোথায় খুঁজে পাবেন লেখার জন্য?

এমনও হতে পারে অনেকে লিখছেন, লিখেছেন, কিন্তু 'নিয়ন্ত্রিত' পত্রপত্রিকা তা ছাপছে না।

'বিবেকের সংকট' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখে 'ইত্তেফাকে' পাঠিয়েছি গত মাসের ১৫-১৬ তারিখের দিকে। ইত্তেফাক লেখাটা আজও ছাপেনি। এখন শুনছি লেখাটা সরকারি মহলের হাতে হাতে ফিরছে। তাঁরা অনেকে পড়েছেন। তাঁদের মনোভাব 'হিং টিং ছটের' মতো।

দেশের এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো তাতে আমার মনে এতটুকু প্রতিক্রিয়া হয়নি, এর মতো জড়তা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার মন এখনো এতখানি জড়ত্ব পায়নি, এটি আমার পক্ষে যুগপৎ দুঃখ ও সান্ত্বনার কথা। দুঃখটা এ কারণে যে, সবকিছু আমাকে ভাবায়, চিন্তিত করে, যা আমার প্রতিকারের বাইরে তা-ও। এতে আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়। কাটাতে হয় অনেক বিনিদ্র রাত। মন ও আবেগ-অনুভূতির জড়ত্ব পাওয়ার মতো দুর্ভাগ্য লেখকের জন্য আর কিছু হতে পারে না। আমার মন এখনো তেমন দশায় পৌঁছায়নি বলে আমি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা বোধ করে থাকি। আমার ওই না-মঞ্জুর লেখাটায় আমি শুধু বিবেকের মানবিক দায়-দায়িত্বের কথাই বলতে চেয়েছি। দোষারোপ করিনি কাকেও। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, সহকর্মীর প্রতি সহকর্মীর, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর, মৃতের প্রতি জীবিতের, মুসলমানের প্রতি

মুসলমানের ব্যবহারের কথা বলেছি শুধু। এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ইসলাম আর ইসলামের নবীর শিক্ষার প্রতি। এমন লেখাও আজ ছাপা যাচ্ছে না আমাদের এ স্বাধীন আর সার্বভৌম দেশে। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া একে আর কী বলবো? 'Sword is mightier than everything'—এ কথা, এত বড় চাক্ষুষ প্রমাণের পরও, আমার মন কিছুতেই মানতে রাজি নয়।

বিবেক, সব রকম মূল্যবোধ, যুগ-যুগান্তের ধর্মচেতনা, আইন ও নৈতিকতা সব কি মিথ্যা হয়ে যাবে? আমার মন বলছে—না। আমার কলম বলছে—না।

পনের

বাংলা ভাষায় 'অধিকার ভেদ' বলে একটি কথা আছে। কথাটি মূল্যবান। অনেকে, বিশেষ করে যাঁরা ক্ষমতাসীন, তাঁরা কথাটাকে মোটেও আমল দিতে চান না। অধিকারের সীমা সম্বন্ধে তাঁরা অনেক সময় থাকেন না সচেতন। চলেন না তাঁর অধিকার মেনে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেই হন হাস্যস্পদ।

ইংরেজ আমলে সারা ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল নানা প্রদেশে। প্রাদেশিক গভর্নরেরা প্রদেশের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলরের দায়িত্বও পালন করতেন। তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে সম্মানের আর গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করা আর ডিগ্রি বা সনদ বিতরণ। বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট বা বিধান অনুসারে এ দায়িত্ব পালন চ্যান্সেলরের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

বলাবাহুল্য, সেকালের গভর্নরেরা সবাই উচ্চশিক্ষিত হতেন, প্রায় সবাই আসতেন অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের পথ মাড়িয়ে। এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা সাহিত্য-শিল্পে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। কাজেই সমাবর্তনে তাঁদের উপস্থিতি বা সভাপতির আসনে তাঁদের তেমন বেমানান মনে হতো না।

পাকিস্তান আমলেও যাঁরা গভর্নর হতেন, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, মোটামুটি সবাই শিক্ষিত ছিলেন। স্যার ফিরোজ খাঁ নূনের

‘আত্মজীবনী’ আমি পড়েছি, চমৎকার সাহিত্যকর্ম।

বাংলাদেশ হওয়ার পর স্বভাবতই প্রদেশ আর রইল না। প্রদেশ হয়ে গেলো একটি দেশ আর সার্বভৌম রাষ্ট্র। ফলে গভর্নর আর থাকলো না। রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কর্তা হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। সেই সঙ্গে তিনিই হলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চ্যান্সেলরও। এ পদ যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি নাজুকও। এ পদ দাবি করে কিছুটা একাডেমিক গুণাবলি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যোগ দেওয়ার পর জানতে পারলাম, প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনো সমাবর্তনই হয়নি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সাত-আট বছরে কয়েক হাজার ছেলে-মেয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকে চলে গেছে বিদেশে। এদের একমাত্র সম্বল প্রভিশনাল সার্টিফিকেট নামে একটি কাগজ। এতকাল এভাবে কাজ চলে এসেছে। একদিন এক অভিভাবক এসে জানালেন তাঁর ছেলে আমেরিকায় ওখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে, প্রভিশনাল সার্টিফিকেটের জোরে সে তো ভর্তি হয়েছে, কিন্তু মূল সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলে ওর ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়াই হবে না। ওর সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন অরিজিনেল সার্টিফিকেট দাবি করছেন। ওটা ছাড়া নাকি ওর পরীক্ষা দেওয়া চলবে না। এরকম আরো বহু ছেলে-মেয়ের জীবনে হয়তো সমস্যা দেখা দিয়েছে, সামনেও দেখা দেবে। অতএব কনভোকেশন তথা সমাবর্তন না হলে নয়। এ ছাড়া পাকা বা কায়েমি ডিগ্রি দেওয়া যায় না। রেজিস্ট্রার আর পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রককে ডেকে সমাবর্তনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলাম। অডিটরিয়াম তখনো অসম্পূর্ণ, করতে হবে খেলার মাঠে সামিয়ানা খাটিয়ে। তাই সুদিন অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বরের দরকার। কনভোকেশনে হাজির হয়ে ডিগ্রি গ্রহণের ফি নির্ধারিত করে তার বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া

হলো বিভিন্ন কাগজে। ডিগ্রির পাঠ ঠিক করে নিয়ে তা মুদ্রণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো সরকারি প্রেসে। প্রাথমিক আয়োজন প্রায় শেষ।

শেখ মুজিব তখন রাষ্ট্রপতি। অতএব চ্যান্সেলরও। অ্যাক্টের বিধান অনুসারে তাঁকেই সমাবর্তনে করতে হবে সভাপতিত্ব। এবং সেইসঙ্গে ডিগ্রি বিতরণও। তিনি কর্মব্যস্ত। রাজনীতির লোক বলে তাঁর কর্মব্যস্ততা অন্য রাষ্ট্রপতির তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই তাঁর কখন সময় হবে তা জেনে নেওয়াই এখন আমার প্রধান কাজ।

ফোনে সময় ঠিক করে নিয়ে এ উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একদিন ঢাকায় গিয়ে গণভবনে উপস্থিত হলাম। তিনি খবর দিয়ে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকেও তখন ডেকে নিয়েছিলেন। আমার প্রস্তাব তাঁকে জানালাম—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এ যাবৎ কোনো সমাবর্তনই হয়নি, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। পাস করে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি, সেভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছি, যেভাবেই হোক সমাবর্তন করে ফেলা। আপনি কখন যেতে পারবেন বলুন, সেভাবে দিন-তারিখ ঠিক করতে হবে, ছাপাতে হবে নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি। তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন—

: আমি কী করতে যাবো?

চ্যান্সেলর হিসেবে আপনাকেই সমাবর্তনে সভাপতিত্ব আর ডিগ্রি বিতরণ করতে হবে।

এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, মানাবেও না। অতগুলো শিক্ষিত পণ্ডিতজনের সামনে আমার মতো একজন অল্পশিক্ষিতের পক্ষে কনভোকেশনে সভাপতিত্ব করা—আমি ভাবতেই পারি না। তাঁর এ কথা শুনে আমি আর মোজাফফরসাহেব একসঙ্গে বলে

উঠলাম–

এ যে অ্যাক্টের বিধান। এ ছাড়া অর্থাৎ চ্যান্সেলরের উপস্থিতি ছাড়া কনভোকেশনই হতে পারে না যে।

তিনি বললেন–

এ যদি অ্যাক্ট হয় তবে সে অ্যাক্ট বদলানো কি যায় না?

তিনি নিজেই বললেন–

চ্যান্সেলরের পরিবর্তে শিক্ষামন্ত্রী, না হয় ভাইস চ্যান্সেলর নতুবা দেশের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদেরই তো সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করা উচিত। মোজাফফরসাহেব, আপনি এ মর্মে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট তৈরি করে ফেলুন।

সেদিনের আলোচনা ওখানেই শেষ হলো। তার অল্পদিন পরে তো তিনিও রইলেন না এ দুনিয়ায়, আমিও থাকলাম না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। মোজাফফরসাহেবও শুধু যে মন্ত্রী থাকলেন না তা নয়, থাকলেন না এ পৃথিবীতেও! Man proposes God disposes. শেখসাহেবের কাণ্ডজ্ঞান অর্থাৎ বিবেচনাবোধ ও অধিকারের সীমা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখে আমি সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন, প্রথম সমাবর্তন আজো হয়নি। সমাবর্তন উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব আমি যেখানে ফেলে এসেছিলাম, মনে হয় আজো সেখানে স্তব্ধ হয়ে আছে। কিছু অগ্রগতি হয়ে থাকলে তা আমার অজানা। ব্যবহারিক সুবিধা-অসুবিধার অতিরিক্ত সমাবর্তনের একটা আবেগী দিকও আছে, তা-ও উপেক্ষণীয় নয়। সমাবর্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঘটনা। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে জ্ঞানী-গুণীজনের সমাবেশে একাডেমিক গাউন পরে ডিগ্রি গ্রহণের মধ্যে যে অপূর্ব শিহরণ আছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজো সে শিহরণ থেকে বঞ্চিত।

আমার মতে সমাবর্তন প্রতি বছরই হওয়া উচিত, তাহলে আয়োজন করা সহজ হয় আর ছাত্রছাত্রীদেরও অকারণ প্রতীক্ষায় থাকতে হয় না এবং চ্যান্সেলরের পক্ষেও বছরে অন্তত একবার সরেজমিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরাখবর নেওয়া সম্ভব হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই এ নীতি অনুসরণ করা উচিত, অর্থাৎ প্রতি বছর 'সমাবর্তন' করে ফেলা।

বিবেকের সংকট

বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষ এখন এক দারুণ সংকট আর রুদ্ধবাক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এ সংকট বাইরের বা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক পরিবর্তনেই শুধু নয়, নৈতিক চেতনা আর বিবেকের সংকটটাই আজ সবচেয়ে বেশি করে দেখা দিয়েছে। আমরা সবাই এখন (যাঁরা বিবেকের ধার ধারেন না তাঁরা ছাড়া) প্রতি মুহূর্তে বিবেকের দংশন অনুভব করছি। এ দুঃসহ অবস্থা ও আত্মিক যন্ত্রণাকে যদি মুক্তি তথা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে এমন দিন খুব দূরে নয়, যখন জাতি হিসেবে আমরা সম্পূর্ণ বিবেকহীন, হৃদয়হীন এক জড়বস্তুর শামিল হয়ে পড়বো। তখন চিরদাসত্ব হবে আমাদের ভাগ্যের লিখন। গোলাম হুকুমের তাঁবেদার মাত্র, তার কোনো বিবেক বা বিবেকের অভিব্যক্তি থাকে না, স্বাধীনতার অর্থ নিশ্চয়ই তা নয়।

এ অবস্থা থেকে আমাদের বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে দেশকে–দিতে হবে বাঁচার সুযোগ। আপাতত এ করার একমাত্র উপায় জাতির বিবেকের মুখপাত্র যাঁরা–অর্থাৎ লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সবাইকে নির্ভয়ে কথা বলার, আলোচনা-সমালোচনা করার সুযোগ দেওয়া। রুদ্ধদ্বার বিবেকের দরজা-জানালা খুলে না দিলে তাতে বাইরের স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্ত আলো-হাওয়া প্রবেশ করতে পারবে না। না পারলে তার হৃদয় আর বিবেকের অকালমৃত্যু অনিবার্য। জাতির মুখপাত্রদের এ

দশাপ্রাপ্তি মানে সারা জাতির এ দশা ঘটা। গত তিন-চার বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে আমরা জাতি হিসেবে দিন দিন হৃদয়হীন, বিবেকহীন হয়ে যাচ্ছি না? শত শত মানুষের সামনে যখন কোনো আদমসন্তানকে প্রকাশ্য রাজপথে যে কোনো অজুহাতে স্রেফ পিটিয়ে হত্যা করা হয়, তখন অগণিত সক্ষম জনতা অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে সে বর্বর দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে। আমরা অনেকে তখন অসহায় দর্শক বনে যাই। পরদিন আমাদের সংবাদপত্রগুলোও এ বর্বরতাকে ফলাও করে প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। উচ্চারিত হয় না কোনো মহল থেকে কোনো নিন্দা বা প্রতিবাদ। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শক্তিরও যেন এ ধরনের ব্যাপারে কিছুমাত্র করণীয় নেই। এ রকম ঘটনা রাজধানীর বুকে এবং অন্যত্র একবার দু'বার নয়, বহুবার ঘটেছে। দেশের বিবেক একবারও সোচ্চার হয়নি এ ধরনের বিবেকহীনতার বিরুদ্ধে।

তাই মনে প্রশ্ন জাগে, কোথায় আইন, কোথায় শৃঙ্খলা, কোথায় সভ্য আচরণ; কোথায় ইনসাফ? যে ইনসাফ ইসলামের এবং যে কোনো সভ্যতার এক প্রধান স্তম্ভ। সব রকম মানবিক চেতনা এভাবে আমাদের জীবন থেকে যেন দিন দিন বিদায় নিচ্ছে। এর ফলে আমাদের ভাষায় 'গণপিটুনি' নামে এক বর্বর শব্দেরও উৎপত্তি ঘটেছে। এভাবে আইন বা ইনসাফ শুধু নয়, আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ আর মানবিক চেতনাও প্রতিদিন পদদলিত হচ্ছে। তাই ভাবি, জাতি হিসেবে আমরা কোথায় নেমে যাচ্ছি? আমরা কি এক বর্বর জাতিতে পরিণত হতে চলেছি? এমন জাতির মুখে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির বুলি স্রেফ প্রহসনের মতো শোনায় না কি?

আমাদের দেশ ও রাষ্ট্র আছে, আছে ধর্ম ও শাস্ত্র, আছে স্বাধীনতা—এমনকি আইন-আদালত, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টও

রয়েছে, কিন্তু এসবের পেছনে যে মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্য, তার চর্চা, অনুশীলন ও বাস্তবায়ন ছাড়া সামাজিক জীবনে এসবের কতটুকুই বা মূল্য। তাই এসব কথা আমাদের মুখে আজ স্রেফ ফাঁকা বুলিতে পরিণত। আমরা অহরহ ধর্মের নাম ইসলামের নাম আউড়ে থাকি। দোহাই দিয়ে থাকি আল্লাহ-রসুলের। দেশের বেতার-টেলিভিশনও অহরহ শোনায় ধর্মের বাণী। কিন্তু জীবনে ও কর্মে এসবের সঙ্গে যে আমাদের কিছুমাত্র সংযোগ নেই তা বোধকরি না বললেও চলে। ইসলাম তো বিমূর্ত শিল্প কিংবা অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু নয়। তার একটা বাস্তব বা চক্ষুগ্রাহ্য রূপ আছে। মোটামুটিভাবে শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালনের ভিতর দিয়ে তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। শরিয়তকে বাদ দিলে ইসলাম স্রেফ বায়বীয় হয়ে দাঁড়ায়। আমার বিশ্বাস ইসলাম বায়বীয় বা অশরীরী কোনো কবি-কল্পনা নয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার আশি ভাগেরও বেশি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে সবাই হয়তো শরিয়তের সব হুকুম-আহকাম পালন করে না কিন্তু সামাজিক আর জাতীয় ক্ষেত্রে তা নগ্নভাবে অবহেলিত হতে দেখলে সবাই অল্পবিস্তর মনঃক্ষুণ্ন হয়ে থাকে বই কি। প্রকাশ্যে কেউই ধর্মের কিংবা শরিয়তের অবমাননা দেখতে চায় না। তা পালিত হলে অধার্মিকজনও মনে মনে খুশি হয়, স্বস্তিবোধ করে। সামাজিক রেওয়াজ বা কনভেনশনকেও একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই কট্টর অর্ধামিকেরও মৃত্যুর পর জানাজা পড়া না হলে তার আত্মীয়স্বজন তো বটে এমনকি তার দুশমনেরাও নাখোশ হন এবং আপত্তি জানান।

আমাদের স্বাধীনতার আয়ু খুব দীর্ঘ নয়। সুদীর্ঘকাল আমরা ইংরেজদের অধীন ছিলাম। তারপর সিকি শতাব্দী ধরে তাঁবেদার ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর থেকে আমাদের স্বাধীনতার শুরু। তখন থেকে বাংলাদেশ পুরোপুরি স্বাধীন রাষ্ট্র। এ স্বাধীনতার জন্য আমরা শেখ মুজিবের

কাছে ঋণী। তিনি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর নাম জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে এবং অনুপস্থিতিতে যে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল তাতেও তাঁকেই করা হয়েছিল সে সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সে সরকারই নিয়ন্ত্রণ করেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে, সে সরকারের বাস্তব বা কাল্পনিক রাজধানীর নাম 'মুজিবনগর' হয়েছিল। অন্য নাম কারো মাথায় আসেনি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে শেখ মুজিবের নাম মুছে ফেলা যাবে না। তিনি বাংলাদেশের গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর মৃত্যুর পর আমি 'যার যা প্রাপ্য' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আজ শেখ মুজিবুর রহমান নেই, তাঁর সম্বন্ধেও জাতিকে আমি ওই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—অর্থাৎ 'যার যা প্রাপ্য'। জাতির কাছে শেখ মুজিবের কি কোনো প্রাপ্য নেই? এ নশ্বর পৃথিবী থেকে তাঁকে কি আমরা একদম খালি হাতেই বিদায় দেবো? বাংলাদেশে ছ'টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, হাজার হাজার স্কুল-কলেজ মাদ্রাসা আছে—অতএব বাংলাদেশ যে কিছুটা সভ্য দেশ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার জিজ্ঞাসা—তাঁর মতো একজন জননেতার প্রতি আমরা সভ্য মানুষের মতো ব্যবহার করেছি কিনা? বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর? বাংলাদেশের মুসলমান মোটামুটি ধর্মপ্রাণ। অন্য সময় না হলেও জন্ম আর মৃত্যুতে এদেশের মুসলমানরা শরিয়তের নিয়মাবলি পালন করে থাকে। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর তা পালিত হয়েছে কিনা অর্থাৎ শরিয়ত মোতাবেক তাঁর দাফন-কাফন-জানাজা ইত্যাদি হয়েছে কিনা? বলা হয়েছে "প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।" জানাজা এ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত কিনা? সেদিন আর যাঁরা নিহত

হয়েছেন তাঁদেরও কোনো জানাজা হয়েছে কিনা? সংক্ষিপ্ত সরকারি বিবৃতিতে জানাজার উল্লেখ নেই। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির যথাবিধি জানাজা আদায় হয়েছে এ খবর জানতে পারলে আমাদের মতো সাধারণ মুসলমানের অশান্ত বিবেক কিছুটা হয়তো শান্তি লাভ করতো। অধিকন্তু বর্তমান রাষ্ট্রপতি (খোন্দকার মোশতাক) আর তাঁর সহকর্মীরা যখন প্রায় সবাই শেখসাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘকালের সঙ্গী-সাথী এবং স্নেহপুষ্ট ছিলেন, নিহত শেখসাহেবের রূহ নিশ্চয়ই এ দাবিটুকু তাঁদের কাছে করতে পারে।

শেখসাহেবের এক নিকট-প্রতিবেশী এ বলে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন—'প্রতিবেশীর প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তা আমি পালন করতে পারিনি। সে কর্তব্য অতি সামান্য। প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তাঁর দাফন-কাফনে সহায়তা করা, জানাজায় শরিক হওয়া। সেটুকুও আমি করতে পারি নি। এ বেদনা আমাকে সারা জীবন বইতে হবে।'

শেখ নিজে মানুষটাও ছিলেন ওই রকম। সহকর্মী কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলে সে যশোর, খুলনা, চাটগাঁ, নোয়াখালী, সিলেট যেখানেই হোক ছুটে যেতেন। জানাজায় শরিক হতেন। জানাজায় শরিক হতে না পারলে পরে সুযোগমতো গিয়ে কবরের পাশে দাঁড়াতেন, জেয়ারত করতেন। ঢাকায় হলে তো কথাই নেই। তিনি নিহত হবার পর তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীরা তাঁর জানাজায় শরিক হয়েছেন, তেমন কথা শোনা যায়নি। বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান আর তাঁরা মন্ত্রীদের কাছে তাঁর এ দাবিটুকু অনায়াসে করতে পারতেন।

রাষ্ট্রপ্রধান বা জননেতা হিসেবে না হোক, একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে তাঁর মরদেহের প্রতি এ প্রাথমিক দায়িত্বটুকু যদি পালন করা না হয়ে থাকে তার চেয়ে বেদনার বিষয় আর কী হতে পারে? এ বেদনা বাংলাদেশের বুকের ওপর চিরকাল একটা ভার

হয়ে থাকবে।

শেখ মুজিবের জন্ম মুসলমানের ঘরে। শুনেছি তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর যে দু'চারবার দেখা আর আলাপ-আলোচনা হয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে ধর্মের ওপর তাঁরও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হয়ে যাই তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো মসজিদ ছিল না, আমি একটা মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছি শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে নিজের খাস তহবিল থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বলেছিলেন, আগামী অর্থ-বছরে তিনি আরো বেশি করে টাকা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো যখন চট্টগ্রামে আসেন, জনসভায় ভাষণ দিতে উঠে সর্বাগ্রে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা আর দোয়া-দরুদ পড়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন। উক্ত জনসভায় আমি সভাপতি ছিলাম বলে এ দৃশ্য আমার চাক্ষুষ দেখা।

যাঁরা মনে করেন তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তাঁরা তো এ সময়টুকু বাদ দিয়ে তাঁর আগের জীবন ১৯৭২-এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দেশের জন্য যা করেছেন তার বিচার করে তার মূল্যায়ন করতে পারেন। আমার বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি হিসেবে না হোক দেশের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নেতা হিসেবে আর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে তাঁর যে বিরাট অবদান রয়েছে তার জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে কখনো ভুলতে পারবে না। তাদের মানসপটে তাঁর স্মৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জেল-জুলুম-বন্দুক-রাইফেল মানুষের স্মৃতিকে কখনো মুছে ফেলতে পারবে না।

দেশ এইসব ভুলে যাবে কী করে? তাঁর রাজনৈতিক জীবন কিছুমাত্র অগৌরবের কিংবা ছিল না অশ্রদ্ধেয়। যুদ্ধ পরবর্তী

বিশৃঙ্খল দেশ শাসনে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকলে জন্য বড্ড বেশি মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। এ মূল্য দেওয়া-নেওয়াটা সব রকম সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে আমরা দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত বোধ না করে পারছি না। এ লেখার প্রেরণাও সে আতঙ্ক থেকে।

মৃতজনের প্রতি বৈরীভাব রাখতে নেই, ইসলামের শিক্ষাও তাই। আবারও পুনরাবৃত্তি করছি–'যার যা প্রাপ্য' তাকে তা দেয়া উচিত।

ইংরেজিতে যে একটা কথা আছে, 'শয়তানকেও তার প্রাপ্য দিয়ে দাও'–এ ঠাট্টা-বিদ্রূপ কিংবা অর্থহীন হেয় উক্তি নয়। এতে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় রয়েছে। 'যার যা প্রাপ্য' কথাটার মধ্যেও রয়েছে সে মূল্যবোধের স্বীকৃতি।

জাতির কাছে শেখ মুজিবের যেটুকু স্বীকৃতি আর সম্মান প্রাপ্য তা দেওয়া হলে, আমার বিশ্বাস, জাতির বিবেক কিছুটা অন্তত শান্তি ও স্বস্তি পাবে।

[রচনাকাল : ২৭ আগস্ট, ১৯৭৫]

শেখ কামাল : স্মৃতিচারণ

খুব ধারাবাহিকভাবে নয়, মাঝে মাঝে অবসরমতো আমার দিনলিপি লেখার অভ্যাস আছে। ২৬-১০-৭৫ তারিখে দিনলিপি লিখতে গিয়ে হঠাৎ শেখসাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের কথা মনে পড়লো। পিতার সঙ্গে তাকেও হত্যা করা হয়েছে। তার সাথে আমার মাত্র বার তিনেকের দেখা। স্রেফ দেখাই। তেমন কোনো আলাপ-পরিচয় ঘটেনি। একবারই দু'একটি কথা বিনিময়ের সুযোগ ঘটে।

প্রথমবার ওকে দেখেছি অত্যন্ত দূর থেকে। শুধু চোখের দেখা–তখন কিশোর কিংবা কৈশোর উত্তীর্ণের পথে ও। সন-তারিখ মনে নেই। খুবসম্ভব, ১৯৬৬-৬৭ই হবে। ঢাকার সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানটের' বার্ষিক অনুষ্ঠান, ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট হলে। আমাকে করতে হয়েছিল সভাপতিত্ব। ভাষণ ইত্যাদি প্রাথমিক পর্ব শেষ হলে শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ গানবাজনা, নৃত্য ইত্যাদি।

মঞ্চ থেকে নেমে এসে আমরা আসন নিয়েছি দর্শকদের চেয়ারে। আমার পাশে বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি তখন 'ছায়ানটের' সভানেত্রী। সমবেত ঐকতানের প্রস্তুতি নিয়ে শিল্পীরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র হাতে মঞ্চে আসন নিয়েছে অর্ধবৃত্তাকারে। শিল্পীদের সারির মাঝখানে দীর্ঘকায় হ্যাংলাদেহ এক ছেলে সেতার হাতে ঋজু হয়ে আসন নিয়ে সংকেতের প্রতীক্ষায় বসে আছে আসন গেড়ে।

সে বয়সেও গোঁফের রেখা স্পষ্ট।

অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুফিয়া কামাল বললেন–

: ওইটি মুজিবের ছেলে।

: কোন মুজিবের?

তখনো এক নামে চিহ্নিত হয়নি। শেখসাহেব।

: শেখ মুজিবের। ছায়ানটের ছাত্র।

শেখ মুজিব তখন জেলে। ভোগ করছেন দীর্ঘ কারাবাস।

তারপর সুদীর্ঘকাল গত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু পদ্মা-যমুনা-মেঘনায় প্রচুর পানি গড়িয়ে যায়নি, দেশের ইতিহাসেও অবিশ্বাস্য রকম রদবদল ঘটে গেছে। সেদিনের কয়েদি আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। উপাচার্য হওয়ার পর বিভিন্ন সময় শেখসাহেবের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাতে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে ছেলেদের শিক্ষা ও মানুষ করা সম্পর্কে আমার উৎকণ্ঠা তাঁকে আমি একাধিকবার জানিয়েছি। এই বইতে অন্যত্র তার উল্লেখও রয়েছে।

১৭ মার্চ শেখসাহেবের জন্মদিন। স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগ প্রতিবছর এ দিনটি পালন করে থাকে। ১৯৭৪-এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য ঢাকার ছাত্রলীগ আমাকে অনুরোধ জানায়। আমি রাজি হলাম, তবে দিনে দিনে ফিরে আসতে চাই এ শর্তে।

তারা সেভাবে বিমানের টিকেট পাঠিয়ে দিয়েছিল।

১৭ তারিখ ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে আমি চিন্তা করতে লাগলাম, ওরা আমাকে নিতে আসবে কিনা, এলেও আমি চিনতে পারবো কিনা। ওদের কারো সঙ্গে তো আমার দেখা নেই। এ যাবৎ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ওদের প্রতিষ্ঠানের চট্টগ্রাম শাখার সদস্যদের কেউ কেউ। তাদের কেউ আবার আমার সহযাত্রীও

হয়নি।

নিজের ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগটি হাতে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় মেয়ের বাসায় কী করে যাওয়া যায় সেকথা ভাবতে ভাবতে নির্গমনপথে এগোলাম। একধারে দেখলাম একটা ছিপছিপে গোঁফওয়ালা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ লম্বা বলে সহজে চোখে পড়ে। ছেলেটাকে আমি চিনতে পারলাম না।

লাউঞ্জের প্রবেশপথে ছেলেটি এগিয়ে এসে বলে–

: আপনাকে নিতে এসেছি।

বলেই আমার হাত থেকে ব্যাগটি আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজের হাতে নিয়ে নিল। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম–

: তুমি ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এসেছ?

: জি হাঁ।

নম্র কণ্ঠে জবাব দিলো ছেলেটি।

ওর পেছনে পেছনে হেঁটে এসে একটা গাড়িতে উঠে বসলাম। ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলো ও নিজে। এবং শুরু করলো ড্রাইভ করতে। তার আগে ও জেনে নিয়েছে আমি কোথায় উঠবো। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। কিছুদূর যাওয়ার পর আমার মনে হঠাৎ কৌতূহল হলো, জিজ্ঞাসা করলাম–

: তুমি কি করো?

বলল–

: অনার্স পরীক্ষা দিয়েছি সোসিয়োলজিতে।

: ঢাকা থেকে?

: জি হাঁ।

শেখসাহেবের সঙ্গে ছেলেটির দৈহিক সাদৃশ্য আমার মনে ধীরে

ধীরে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—

: তোমার নাম?

: শেখ কামাল।

: ও তুমি আমাদের শেখসাহেবের ছেলে।

: জি হাঁ।

বললাম—

এত সব মন্ত্রীরা থাকতে আজকের অনুষ্ঠানে আমাকে কেন তোমরা নিয়ে এলে প্রধান অতিথি হতে?

তেমনি আবেগহীন কণ্ঠে ও বলল—

: আপনার এক কথা ওঁদের হাজার কথার সমান।

মনে মনে সংকোচ বোধ না করে পারলাম না।

এবারও আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে ও ব্যাগটি নিয়ে তেতলা পর্যন্ত উঠে এলো। যাওয়ার সময় বলে গেল—

: আমি আড়াইটার সময় আসবো আপনাকে নিয়ে যেতে, আমাদের সভা তিনটায় আরম্ভ হবে।

ঠিক তিনটার কিছু আগে এসে ও আমাকে ওর গাড়ি করে সভায় নিয়ে গিয়েছিল। সভায় ঢুকতেই কে এক ছেলে এসে আমার হাতে একটি ফুলের মালা দিলে বলল—

এটি শেখসাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্য। তাঁর শরীর খারাপ না হলে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতেন।

ওই সভাতে আমার প্রথমবারের মতো খোন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে দেখা। তিনি ওই সভার অন্যতম বক্তা। আর এক বক্তা ছিলেন মোল্লা জালাল উদ্দিন। প্রতিমন্ত্রী ক্ষিতীশ মণ্ডলও ছিলেন মনে পড়ে। ওই সভায় শেখ কামাল কোনো ভূমিকা নেয়নি।

সামনের দিকে কোনো সারিতেও ওকে দেখা গেল না। পেছনের দিকে কোথাও হয়তো এককোণে বসেছিল। মনে হলো নেপথ্যেই ওর ভূমিকা।

সভাশেষে আবারও মেয়ের বাসায় নিয়ে গেল ও। বিমানের সময় দেরি নেই। তাই ওখানে আর বসা হলো না। আমার হাতব্যাগটি এবারও নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিচে নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে বসাল। এবারও নিজে ড্রাইভারের সিটে বসে স্টার্ট দিয়ে দিল। দেখলাম ও সব সময় একা।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে বোর্ডিং কার্ড করার জন্য নিজেই ব্যাগটি হাতে নিয়ে কিউর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। রাষ্ট্রপ্রধানের ছেলে বলে কোনোরকম অগ্রাধিকার খাটাতে চাইল না। দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। যখন ওর পালা এলো তখনই শুধু টিকেটটি বাড়িয়ে দিল। বোর্ডিং কার্ড-টার্ড হয়ে যাওয়ার পর বিমান ছাড়া পর্যন্ত ও থেকে যেতে চাইছিল। আমি অনেক বলে-কয়ে ওকে লাউঞ্জ থেকে বিদায় দিলাম। একই দিন ওর গাড়িতে ও আমাকে চারবার লিফ্‌ট দিয়েছে কিন্তু নিজে চারবারও বোধকরি কথা বলেনি। তাতে মনে হলো ও অত্যন্ত স্বল্পবাক।

শুনেছি অত্যন্ত ক্রীড়াপ্রিয় ছিল। রাষ্ট্রপতির ছেলে হয়েও কোনো ধনীর মেয়েকে বিয়ে করেনি, বিয়ে করেছিল দেশের সেরা ক্রীড়াবিদ মেয়েটিকে। বাংলাদেশের সেরা ক্রীড়া সংস্থা 'আবাহনী' ওরই নিজের সংগঠন, ওরই সৃষ্টি।

সেদিন দেখেছিলাম অবিকল বাপের মত করেই গোঁফ রেখেছে ও। সে দিনের ঋজু দেহ দীর্ঘ লিকলিকে চেহারার সুদর্শন তরুণটির নম্র-মধুর ছবি আমার মনে আজও গাঁথা হয়ে আছে। আজ ও নেই, বাংলাদেশের সেরা মেয়ে ক্রীড়াবিদ ওর নববধূটিও গেছে হারিয়ে।

[লেখকের অপ্রকাশিত দিনলিপি থেকে]

পরিশিষ্ট

দায়মুক্তি ও দায়বদ্ধতা : বঙ্গবন্ধু ও আবুল ফজল

আবুল মোমেন

পঁচাত্তরের আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ বিবেকবান যেকোন মানুষকেই ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। আমার বাবা অধ্যাপক আবুল ফজলকে তো বটেই। বঙ্গবন্ধু ওঁকে শ্রদ্ধা করতেন আন্তরিকভাবে। যোগাযোগের সূত্রপাৎ পাকিস্তান আমল থেকেই, বিশেভাবে ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলনের সময় থেকে। এই হত্যাকাণ্ডে বাবার মনোকষ্টের আরও একটি কারণ ছিল বলে মনে হয়। পঁচাত্তরের শেষ নাগাদ বিচারপতি সায়েমের অনুরোধে, তাঁর কয়েকজন মান্যগণ্য প্রবীণ উপদেষ্টার পীড়াপীড়িতে তিনি সরকারে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে। বিচারপতি সায়েম এবং জেনারেল জিয়ার কাছ থেকে কথা নিয়ে দুটি শর্তে তিনি তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। শর্ত দুটি ছিল—সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেলহত্যার বিচার এবং বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার নিরাপদে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা। তাছাড়া সায়েম ও জিয়া উভয়েরই প্রতিশ্রুতি তো ছিলই দ্রুত গণতন্ত্রে ফিরে আসার। মনে মনে তাঁর আরেকটা প্রত্যয় হয়ত ছিল যে তিনি সরকারে থাকলে সম্ভাব্য নির্যাতন-অন্যায় থেকে অনেককে বাঁচাতে পারবেন। সে কাজটা তিনি অনেকের ক্ষেত্রেই করেছেন। এঁদের মধ্যে মুক্তধারা প্রকাশনী সংস্থার স্বত্বাধিকারী চিত্তরঞ্জন সাহা কৃতজ্ঞতার সাথে বাবার সহায়তার কথা সবসময় বলতেন। তবুও

আজীবনের গণতন্ত্রের পূজারী আর সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল মানুষটি কেবল দু'জন ভিন্ন ধাতের টেকনোক্র্যাট মানুষের প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে থাকতে পারেন না। অস্বস্তি নিয়েই তিনি কাজ করছিলেন। আর যখন জেলহত্যা তদন্তে গঠিত বিচারবিভাগীয় কমিটিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে দেখলেন এবং জেনারেল জিয়া ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার দুরভিসন্ধি নিয়ে এগুচ্ছেন বলে সন্দেহ হচ্ছিল তখন তিনি তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করার দিকে মনোযোগ দেন। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়ার গুঞ্জন শুনে উপদেষ্টা বিনীতা রায়কে নিয়ে তাঁদের আপত্তির কথা জানান।

এ সময়ে উপদেষ্টা পদে থেকেই তিনি পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে ছোটগল্প লেখেন—মৃতের আত্মহত্যা। গল্পটি দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা *সমকালে* প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পাঠকদের নজর কাড়ে। বেশ হইচই পড়ে যায়, কপি করে বিলি হয়ে হাতে হাতে ফিরতে থাকে।

গল্পটি তৎকালীন সরকারের নেপথ্যনায়ক জেনারেল জিয়ার প্রতি একজন উপদেষ্টার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জও বটে। জিয়া তখন ধূর্ততার সঙ্গে খেলছিলেন, ফলে বিচারপতি সায়েম ও বয়োজ্যেষ্ঠ উপদেষ্টাদের আড়াল তাঁর প্রয়োজন ছিল। তাই এ নিয়ে তাঁকে ঘাঁটালেন না। কিন্তু বাবা যখন স্পষ্ট বুঝে গেলেন জিয়া কোন প্রতিশ্রুতিই রাখবেন না তখন সংঘাতের পথটা আরও অনিবার্য করে তুললেন পরপর একই বিষয়ে আরও দুটি গল্প প্রকাশ করে। তার আগে থেকেই বাবা সবসময় পকেটে পদত্যাগপত্র রাখতেন। এবং সায়েম ও জিয়াকে জানিয়েও রাখলেন তিনি আর সরকারে থাকতে চান না।

সাতাত্তরের জুনে, প্রায় কুড়ি মাস দায়িত্ব পালনের পর, উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এলেন চট্টগ্রামে। ওঁকে তো

অনেক চাপাচাপি করে উপদেষ্টা পদে যোগ দিতে রাজি করানো হয়েছিল। তাঁকে ধারণা দেওয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে তিনি এ পদে যোগ দেবেন ও স্বল্পসময় দায়িত্ব পালনের পর ফিরে যাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। উনি অবশ্য পুনরায় উপাচার্য পদে ফেরার কথা ভাবেন নি, ভেবেছিলেন নজরুল অধ্যাপক বা এরকম কোন পদে যোগ দেওয়ার সুযোগ হবে। তবে জিয়া এবং তাঁর শূন্যস্থান পূরণে অশালীনভাবে ব্যতিব্যস্ত সৈয়দ আলী আহসানের মনে ছিল অন্য চিন্তা। বাবার আর কোন দায়িত্বে ফেরা হয় নি।

২.

ষাটের দশক থেকে বাবা তাঁর ছাত্রজীবনের অর্জিত মুক্তবুদ্ধির চেতনাকে শাণিত করে নানা বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। কথাসাহিত্যিক থেকে মননশীল প্রাবন্ধিক আবুল ফজলের উত্তরণ ঘটে এসময়। তখন আইউবের সামরিক ও ছদ্মসামরিক শাসনের বর্ম ভেদ করে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটছিল। এতে সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইস্যুতে আবুল ফজলের লেখনির ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম তীব্র রূপ নিচ্ছিল মূলত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। ছয়দফা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা প্রাবন্ধিক আবুল ফজলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাদের চিন্তাবিদকে। বঙ্গবন্ধু এ সময়েই তাঁর লেখার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দুটি লেখা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পুনর্মুদ্রণের জন্যে দুদফা চিঠিও লেখেন। ছোট্ট এ দুটি চিঠিতে বাবার প্রতি শেখ মুজিবের শ্রদ্ধাপূর্ণ সৌহার্দ্যের প্রকাশ ঘটেছে। দুটি চিঠিই তিনি লিখেছেন তাঁর ব্যক্তিগত প্যাডে। মূল বইতে পাঠক এ

চিঠি দুটি পড়তে পাবেন।

শেখ সাহেব এবং বাবারও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সেই উত্তাল সময়ে চট্টগ্রামে একে অপরের আস্তানায় ঢুঁ মেরেও ঘটনাচক্রে তাঁরা দেখা করতে পারেন নি। অল্পের জন্যে অপরজনের সাক্ষাৎ লাভে তাঁদের উভয়ের চেষ্টা বিফলে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর একান্ত আগ্রহে তাঁর গণভবনের দপ্তরে তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ও আলাপের সূচনা হয়েছিল। তারিখ ২০ মার্চ ১৯৭২।

প্রথম দেখা ও আলাপের টুকরো স্মৃতির সূত্রে বাবার কলমে বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছে। 'আমি বারান্দার মাঝপথে থাকতেই তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে বসালেন। তিনি নিজেও বসলেন পাশে। হুকুম করলেন চায়ের। মুহূর্তে এক অসাধারণ উষ্ণ হৃদয়ের যেন পরশ পেলাম।'

বঙ্গবন্ধু বাবাকে প্রস্তাব দিলেন গণভবনে এসে থাকতে ও বসে বসে লিখতে। শুনে বাবা হাসলেন বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে 'মুগ্ধও হলাম তাঁর আন্তরিকতায়–গুণগ্রাহিতায়'।

প্রথম সাক্ষাতের মূল্যায়নে কোন পূর্বধারণার ছাপ থাকে না, স্বতঃস্ফূর্ত ও সতেজ মনের অনুভূতিই তাতে মেলে। বাবা লিখছেন– 'ফিরে এলাম এক অসাধারণ মানবিক উষ্ণতার স্পর্শ নিয়ে, এ উষ্ণতা অত্যন্ত আন্তরিক ও অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

তারপর শেখ মুজিবকে 'দেশের এ যুগের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব' আখ্যায়িত করে তিনি লিখছেন, 'শালপ্রাংশু দেহ শেখ মুজিবের মুখের দিকে চেয়ে থাকা যায় অনেকক্ষণ ধরে। ঐ মুখে কোন রুক্ষতা কি কর্কশতার চিহ্ন ছিল না। তাঁর হাসি ছিল অপূর্ব, অননুকরণীয়। এমন হাসি অন্য কারও মুখে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

আর ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর তাঁর কাছে এসেছে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত। অবর্ণনীয় সেই ক্ষতি তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। 'বাংলাদেশের স্রষ্টা স্বয়ং শেখ মুজিব, এমন অকল্পনীয়' হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে পারেন তা ছিল তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য। লিখছেন—'শেখ মুজিব না থাকাটা যে বাংলাদেশের জন্য কত বড় শূন্যতা তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি ছিলেন সারা দেশের সামনে ঐক্যের প্রতীক ও ঐক্য রক্ষাকারী মহাশক্তি। সে প্রতীক, সে শক্তি আততায়ীর গুলিতে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। এ নির্মম ঘটনায় যন্ত্রণাবিদ্ধ আমরা সবাই। যে যন্ত্রণা ভাষার অতীত।

একটু পরে আফশোসের সাথে লেখেন, 'আমাদের সামনে আজ এমন কোন মহৎ কবি নেই, যে কবি বাংলাদেশের অন্তরের এ নীরব কান্নাকে ভাষায় কিংবা ছন্দে রূপ দিতে পারেন।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেককেই নেতা মেনেছেন, কেউ কেউ ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। তবে মধ্য ষাট থেকে, বিশেষত ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব বাংলা যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের জোয়ারে জেগে উঠেছিল তখন জায়মান অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের চিন্তানায়কদের সাথে বঙ্গবন্ধুর যোগাযোগ ঘটেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীসহ অনেকের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগাযোগ বাংলাদেশের গঠন-পর্বের রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। এ সময় প্রবীণ আবুল ফজল মুক্তবুদ্ধির সাহসী চিন্তাবিদ হিসেবে এ বাংলায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষীর স্থান পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক চেতনার অগ্রণী একজন চিন্তাবিদ লেখক হিসেবেই আবুল ফজলকে গভীর শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে, বাবাকে প্রায় সত্তর বছর বয়সে উপাচার্য হিসেবে অস্থির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরার দায়িত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং

উপাচার্যের প্রতি আচার্যের ভূমিকা ও আচরণে বরাবর শ্রদ্ধাপূর্ণ ঔদার্য দেখিয়ে প্রকাশ করে গেছেন।

৩.

বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারবর্গের নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাবা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না, 'মনের ওপর পাপের এক গুরুভার' নামাতে পারছিলেন না।

নির্মম হত্যাযজ্ঞের সপ্তাহখানেক পরে ২৩-৮-৭৫ তারিখ ডায়েরিতে তিনি লেখেন, 'এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। তবুও পারছি না বিবেককে এতটুকু হালকা করে তুলতে। এক দুর্বহ বোঝার ভারে বিবেক আমার স্তব্ধ ও বোবা হয়ে আছে এ ক'দিন। এ এক অকল্পনীয় পাপের বোঝা– আমার, আপনার, সারা বাংলাদেশের।'

তিনদিন পরে ২৬-৮-৭৫ তারিখে লিখছেন– 'বাংলাদেশের মানুষকে বাঙালি বলে পরিচয় দেওয়ার হিম্মৎ কে জুগিয়েছে? শেখ মুজিব ছাড়া এর কি দ্বিতীয় কোন জবাব আছে? শেখ মুজিবকে হত্যা করা মানে, এক অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে হত্যা করা। তিনি ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের হিম্মৎ আর সংগ্রামের প্রতীক।'

ঐদিনই আরও লিখেছেন: 'নিঃসন্দেহে শেখ ছিলেন এ যুগের সর্বপ্রধান বাঙালি। সে সর্বপ্রধান বাঙালিকে আমরা বাঙালিরাই কিনা নিজের হাতে হত্যা করলাম! আশ্চর্য, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও সত্য হল।

'বাঙালিকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে কে জুগিয়েছিল সাহস? শেখ মুজিব নয় কি? বজ্রগর্ভ আর অমিত প্রেরণার উৎস 'জয়বাংলা' স্লোগান কে তুলে দিয়েছিল বাঙালির মুখে? শেখ মুজিব নয় কি?'

সবশেষে মনের ভার ও বিবেকের পীড়াটা কিছুটা হলেও লাঘব করার জন্যেই যেন লিখলেন 'বিবেকের সংকট' নামে প্রবন্ধ। কিন্তু ৪ অক্টোবরের ডায়েরির লেখা থেকে জানতে পারি যে লেখাটি পাঠানোর পর তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও 'ইত্তেফাক লেখাটি আজও ছাপেনি'।

৪.

এরকম দুর্বহ বিবেকের সংকটে পীড়িত হতে হতেই ইতিহাসের ঘূর্ণিচক্র তাঁকে টেনে নিয়ে গেল বাংলাদেশের বিতর্কিত এক সরকারের ভিতরে। উদার মানবিক আদর্শবাদ ও ব্যক্তিগত সততা ও আত্মমর্যাদার মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাদাসিধে সত্তরোর্ধ মানুষটি শিক্ষা ও জীবনাদর্শে মোটামুটি তাঁর চেনা বলয়ের উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্টের চাপ শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারেন নি।

তখন বাংলাদেশের ইতিহাসের চতুর ধূর্ত খলনায়ক জেনারেল জিয়ার অভিসন্ধি তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়নি। তবে দিনে দিনে তাঁর বিবেকের সংকট বেড়েছে এবং সে ভার লাঘবের দায় কেবলই জোরদার হয়েছে। লেখকের যে ইতিহাসের প্রতি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দায় আছে সেটা তিনি কখনও ভোলেন নি। 'মৃতের আত্মহত্যা' গ্রন্থের ভূমিকায় (কৈফিয়ৎ) তিনি এ ঘটনাকে 'শতাব্দীর করুণতম, নিষ্ঠুরতম বিয়োগান্ত এক নাটক' হিসেবে উল্লেখ করে লিখেছেন, 'আমি তেমন বড় লেখক নই। তবে ছোট লেখকও দায়িত্বমুক্ত নয়। এ বই আমার তেমন এক ছোট দায়িত্ব পালন।'

তাঁর এ গল্পগুলো সম্পর্কে তিনি আগেই একটু সতর্ক ও রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়েছেন। তাই পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাঁর নিবেদনঃ 'এ গল্পগুলিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ কিংবা প্রতিহিংসা-প্রতিশোধের মনোভাব থেকে এর

উৎপত্তি নয়।'

'মৃতের আত্মহত্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৭৮, সমকাল প্রকাশনী থেকে। প্রকাশকের কথায় সামসুর রহমান সেলিম জানাচ্ছেন, "মৃতের আত্মহত্যা' সমকালে প্রকাশিত হওয়ার পর সারা বাংলাদেশে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়। দেশ-বিদেশেও গল্পটির জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয় বলেও জানা গেছে। তারপর পনেরই আগস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবুল ফজল সাহেব আরও তিনটি ছোট গল্প লেখেন। প্রথম তিনটি গল্প 'মৃতের আত্মহত্যার', 'নিহত ঘুম', ও 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর' সমকালে প্রকাশিত হয়েছে। শেষ গল্প 'কান্না' বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।"

মুজিব হত্যার পরপরই আবুল ফজল বিবেকের বোঝা ও পীড়া অনুভব করতে থাকেন, আর উপদেষ্টার দায়িত্বভার নিয়ে সে বোঝা ও সংকট কেবল গভীরতর হয়েছে। সেই বোঝা কিছুটা হলেও এবং নিজের মনের ভার হাল্কা করতে গিয়ে বাবা যেন একের পর এক এই গল্পগুলো লিখে গিয়েছেন।

গল্প শিল্পোত্তীর্ণ হল কিনা এ নিয়ে তিনি তেমন ভাবিত ছিলেন না, শিল্প সৃষ্টির চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিবেকের এবং ইতিহাসের দায় পালনই তাঁর কাছে ছিল মুখ্য। এ মর্মন্তুদ ঘটনার সুস্পষ্ট কার্যকর প্রতিবাদের দায় তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। ৪-১০-৭৫ তারিখ ডায়েরিতে লিখেছেন: 'শেখ সাহেবের হত্যা সম্পর্কে আমি অনবরত বিবেকের একটা দংশন অনুভব করছি। এত বড় একটা দ্বিতীয় কারবালা ঘটে গেল দেশে, নির্মমতায় যে ঘটনার জুড়ি নেই ইতিহাসে। সে সম্পর্কে দেশের সর্বাপেক্ষা সচেতন অংশ শিক্ষিত আর বুদ্ধিজীবী সমাজ কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করছে না, এ ভাবা যায় না। আশ্চর্য, মননশীল লেখক-শিল্পীদের মধ্যেও তেমন একটা

সাড়া দেখা যায়নি এ নিয়ে। আগের মতো এখনো আমাদের তরুণ কবিরা একটানা অতি নিরশ ও নিষ্প্রাণ প্রেমের বা 'আমি-তুমি' মার্কা কবিতা লিখে চলেছেন।'

বোঝা যায় পঁচাত্তরের আগস্টের পর থেকেই তিনি এ নিয়ে কিছু লেখার তাগিদ অনুভব করছিলেন। দু'সপ্তাহের মধ্যেই লেখেন 'বিবেকের সংকট' প্রবন্ধ। আর উপদেষ্টা পদে যোগ দিয়ে বোঝেন যে তাঁর দায়মুক্তি ঐ লেখাতে ঘটে নি। সে দায় আরও ভালোভাবে তাঁর ওপর চেপেছে। ফলে ৭৭-৭৮ দু'বছরে চারটি গল্প লিখলেন তিনি তাঁর ভাষায় 'দ্বিতীয় কারবালা'র ঘটনাবলী নিয়ে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বাঙালির ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞের এমন ঘটনার দ্বিতীয় নজির নেই। তাই সম্ভবত ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই হতচকিত হয়েছেন, হতবুদ্ধিও হয়েছেন। মনের এ বিপর্যয় কাটাতে একটু সময় লেগেছে বটে, কিন্তু অচিরেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখার—কবিতা, ছড়া, গান—জোয়ার শুরু হয়েছে আবার।

৫.

'৭৭-এ প্রথম গল্প 'মৃতের আত্মহত্যা' যখন প্রকাশিত হচ্ছে ততদিনে সংবিধান স্থগিত, ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর কোপ পড়েছে, রাজনীতিহীনতার মধ্যেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের উদ্যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ সময়ে সায়েম ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর আড়ালে জিয়া ও তাঁর পার্শ্বচরদের ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়ছিল। লেখক ও বিবেকি মানুষ আবুল ফজল আর চুপ থাকতে পারেন নি, নীরবে মেনে নিতেও পারেন নি। পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েই তিনি প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গল্পগুলো লিখতে ও প্রকাশ করতে শুরু করেন। কোন রকম রূপক বা প্রতীকের আশ্রয় নেননি প্রতিবাদী এ

লেখক। চারটি গল্পের মধ্যে প্রথম দুটিতে–মৃতের আত্মহত্যা ও নিহত ঘুম–ঘটনা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মানসিক যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। আর পরের দুটিতে–ইতিহাসের কণ্ঠস্বর ও কান্না–পাই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আপন মানুষদের মনোকষ্টের কাহিনী।

মৃতের আত্মহত্যার মূল চরিত্র সোহেলি, এক খুনী মেজরের স্ত্রী, দূর মরুভূমিতে যে কেবল দেশ ও পরিজনদের ছেড়ে থাকার নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে না, তার আপনজনের কৃতকর্মের জন্য সে যে আজ 'খুনীর বৌ, বকুল খুনীর সন্তান', এ পরিণতি সে মানতে পারে না। বকুল তাদের সন্তান, সোহেলির জীবন থেকে আনন্দ-উৎসাহ উধাও হয়ে যায়, স্বামীর অন্যায় খুনের জের টানে সে জীবনের প্রতি সকল আগ্রহ হারিয়ে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় নিরপরাধ বিবেকি নারী।

'নিহত ঘুম' গল্পটি এক অজ্ঞাতনামা সৈনিকের ডায়েরির অংশ হিসেবে তারই বচনে বিবৃত হয়েছে। এ সৈনিক ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল আর তারপর থেকে সে-ঘটনা দুঃসহ স্মৃতি হয়ে তাকে তাড়াতে থাকে। এক দিনের জন্যও সে আর ঘুমোতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত তারও মৃত্যু ঘটে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে।

তৃতীয় গল্পটির নাম 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর'। এখানে পাই বঙ্গবন্ধুর ছোটচাচা শেখ আহমদ আলীর জবানিতে 'দ্বিতীয় কারবালা'র ফলে তাঁদের জীবনও কিভাবে সেই একই ঘটনার দ্বারা তাড়িত হচ্ছে সে বিবরণী। তিনি চাইলেন বঙ্গবন্ধুর ঘরটি আবার সজীব করে তুলতে, বেঁচে যাওয়া নাতনিদের ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু এ ঘটনার অভিঘাত এতই প্রবল যে কারও পক্ষেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। অদৃশ্য আওয়াজ তাঁদের অস্থির করে তোলে–তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়।

শেষ গল্প 'কান্নায়' তিনি সেদিনের হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর শিকার শিশু রাসেলের এক সহপাঠী বন্ধুর জীবনেও এ ঘটনা কী ভয়ানক ছাপ ফেলে গেছে তা জানিয়েছেন। অধ্যাপক শহীদ ও আলফা বেগমের ছোট ছেলে শাহীন শেখ রাসেলের সাথে (গল্পে রুশো) একই স্কুলে একই সাথে পড়ে। দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে মূলত রুশোরই টানে। এ গল্পে শিশু রাসেলের সারল্য ও জীবনের সৌন্দর্য, বেগম মুজিবের স্নেহমাখা মাতৃত্ব এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়ির অনাড়ম্বর সাদাসিধে রূপ ফুটে ওঠে।

৬.

আবুল ফজল পঁচাত্তরের ঘাতকদের দায়মুক্তির বিধান নিয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং যে দুই শর্তে তিনি উপদেষ্টা পদে যোগ দিয়েছেলেন তাতে হত্যার তদন্ত ও বিচারের বিষয়টি ছিল প্রধান। বিচারের বিষয়ে সরকারের উদাসীনতা দেখে এবং প্রথম পর্যায়ে ইতিহাসের এমন জঘন্য হত্যাকাণ্ডে লেখক-শিল্পীদের তেমন প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছিলেন। তিনি প্রতিবাদের যে আয়ূধ হাতে তুলে নেন তাতে তাই যেন জোর পড়েছে প্রকৃতির বিচারের দিকে। মানুষ তার বিচার ব্যবস্থাকে অচল করে রাখলেও প্রকৃতির বিচার বন্ধ করা যায় না।

তবে এ প্রত্যাশার মধ্যে যেমন সততা ছিল তেমনি ছিল সারল্য। ইতিহাস আদতে তখন সরল ও সৎ পথ ছেড়ে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যার কুটিল কুহকে ঢুকে পড়েছে। বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতি ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে বটে কিন্তু সেই কুটিল কুহকের পথ থেকে যেন সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারে নি। সংবেদনশীল বিবেকি লেখক আবুল ফজল যেমনটা আশা করেছেন যে খুনীরা, তাদের স্বজনরা আত্মোপলব্ধি করবে, আক্ষেপে ও অনুতাপে জ্বলবে–অন্যকথায়

মনোযন্ত্রণার ভিতর দিয়ে সত্যের পথে আসবে তেমনটা বাস্তবে ঘটেছে বলে মনে হয় না।

শেষ দুটি গল্পের মধ্যে এ ঘটনায় সৎ সরল মানুষের কষ্টের কথা আছে, তাঁরা এর থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন সরাসরি তার ইশারা নেই। তবে স্বজনদের এমন কষ্টভোগের পরিণতি নিশ্চয় আবার মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটাবে এবং দ্বিতীয় কারবালার ঘটনার বিচার–আদালতের ও প্রকৃতির উভয় বিচার নিশ্চিত করবে, এমনটাই তিনি বিশ্বাস করেছেন। আবুল ফজলের সে বিশ্বাস তাঁর মৃত্যুর পরে শহীদজায়া জাহানারা ইমামের ঘাতক-দালাল বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে সত্যিই গণদাবিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। বিশেষভাবে দেশের শিক্ষিত সচেতন তরুণসমাজ এ দাবির পক্ষে স্পষ্ট ভূমিকা নিতে শুরু করে। আর এই দুই দশক পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দ্বিতীয় দফায় নিরঙ্কুশ জয়ে ক্ষমতায় এসে প্রথমে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের হত্যাকারীদের বিচার করে রায় কার্যকরের ব্যবস্থা করেছেন। তারপর ট্রাইব্যুনাল গঠন করে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচারের সূচনা করে রায় কার্যকর করছেন।

এখন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু কেবল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও রূপকার নন, তিনিই এ জাতির মহানায়ক। হত্যাকাণ্ডের প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে সৃজনশীল মানুষ তাঁকেই উপজীব্য করে কবিতা-গান-প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে। তাঁর বহুমাত্রিক ভূমিকা, অবদান, ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাজনীতিতে, জাতীয় জীবনে ও ইতিহাসে তাঁর অবস্থান সবার আগে, সবার ওপরে।

একজন ছোট লেখকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের প্রয়াস জাতির পক্ষ থেকে ঋণ স্বীকারের এবং প্রতিবাদ ও বিচারের প্রথম

পদক্ষেপ ছিল।

আজীবন মুক্তবুদ্ধির সাধক আবুল ফজল এ গল্পগুলোর মাধ্যমে নিজেকে দায়মুক্ত করলেন আর আপন বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকলেন।